তথ্য কণিকা

জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০১৯

শিক্ষায় বন প্রতিবেশ
আধুনিক বাংলাদেশ

বন অধিদপ্তর
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশের ভূমি ব্যবহার মানচিত্র ২০১৫

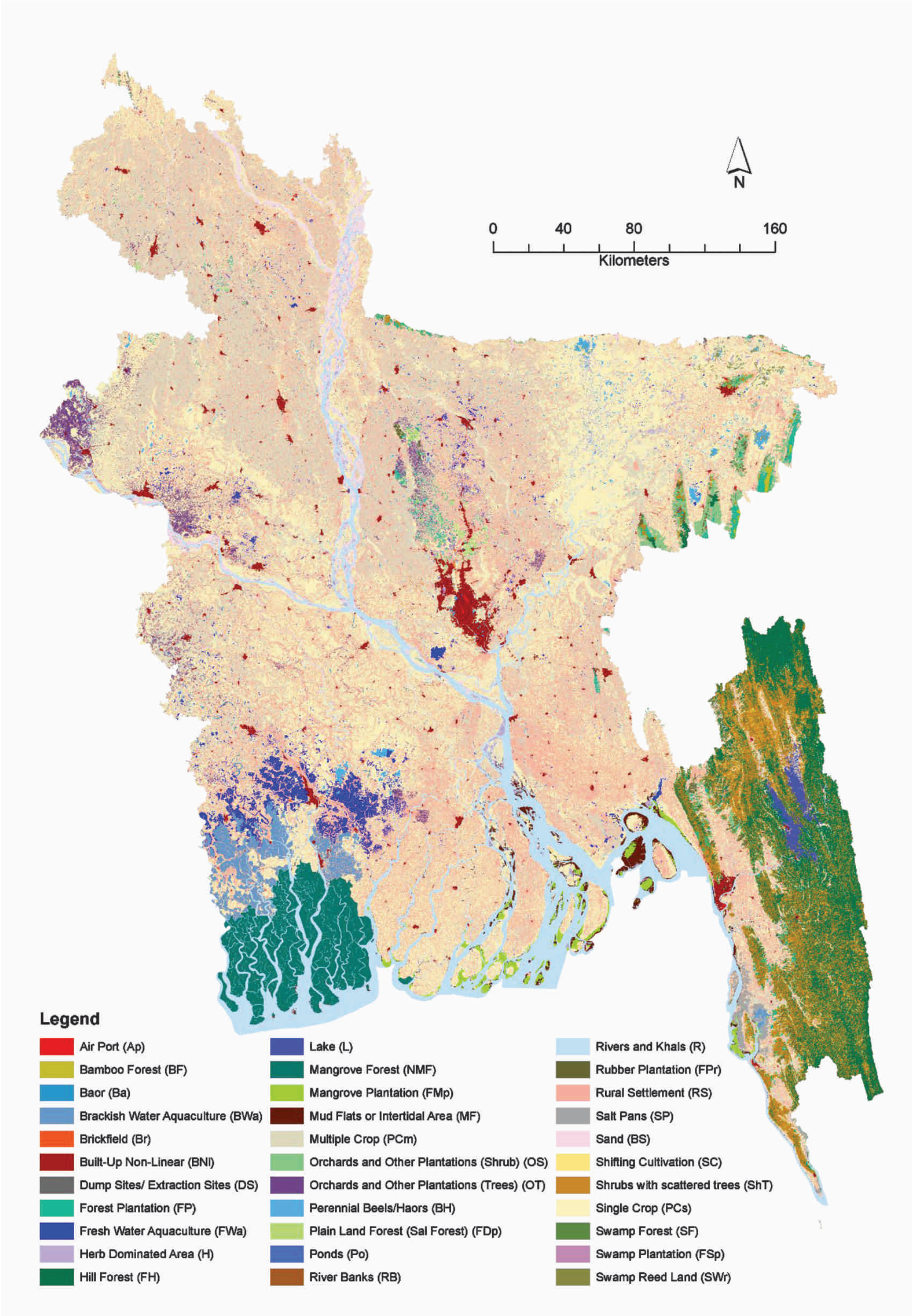

বাংলাদেশের বন

বাংলাদেশের আয়তন ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৫৭০ বর্গ কি.মি. এবং সরকার নিয়ন্ত্রিত বনভূমির পরিমাণ প্রায় ২৩ লক্ষ হেক্টর যা দেশের মোট আয়তনের প্রায় ১৫.৫৮% । বন অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত বনভূমির পরিমাণ প্রায় ১৬ লক্ষ হেক্টর যা দেশের আয়তনের প্রায় ১০.৭৪% । **বাংলাদেশের বৃক্ষ আচ্ছাদিত ভূমির পরিমাণ দেশের মোট আয়তনের ২২.৩৭%** । ভৌগোলিক অবস্থান ও জলবায়ুর তারতম্যের কারণে বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের বনাঞ্চল রয়েছে। যেমন- পাহাড়ী বন, প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন, সৃজিত উপকূলীয় বন, শালবন, জলাভূমির বন ইত্যাদি।

পাহাড়ী বন

অবস্থান: চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, কক্সবাজার, সিলেট, মৌলভীবাজার এবং হবিগঞ্জের পাহাড়ী এলাকা।

শীলখালীর গর্জন বন

সাঙ্গু নদীর তীরের পাহাড়ী বন

পরিমাণ: উল্লিখিত জেলাসমূহের সরকারি বন এবং পার্বত্য জেলার অশ্রেণিভুক্ত বনাঞ্চলসহ পাহাড়ী বনের পরিমাণ প্রায় ১৩ লক্ষ ৭৭ হাজার হেক্টর যা দেশের আয়তনের ৯.৩৩% । বন অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত পাহাড়ী বনভূমির পরিমাণ ৬ লক্ষ ৬৪ হাজার হেক্টর যা দেশের আয়তনের ৪.৫৪% এবং বন অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত বনভূমির ৪৩% ।

উদ্ভিদ প্রজাতি: গর্জন, চাপালিশ, তেলসুর, উড়িআম, ঢাকিজাম, সিভিট, সেগুন, গামার, চম্পা, জারুল, বৈলাম প্রভৃতি গাছ এ বনে পাওয়া যায়। এছাড়া এ বনাঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে বাঁশ ও বেত পাওয়া যায়।

বন্যপ্রাণী: এ বনের উল্লেখযোগ্য বন্যপ্রাণী হচ্ছে হাতি, চিতাবাঘ, বন্যশুকর, হরিণ, হনুমান, বানর, উল্লুক, সজারু, বনরুই, ধনেশ, মথুরা, বনমোরগ, শকুন, অজগর, টিয়া, ময়না ইত্যাদি।

শাল বন

অবস্থান: এ বন মূলতঃ কুমিল্লা, গাজীপুর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ ও শেরপুর জেলায় অবস্থিত। তাছাড়া দেশের উত্তরাঞ্চলের দিনাজপুর, রংপুর, লালমনিরহাট, নওগাঁ, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড় জেলায় অল্প কিছু শাল বন রয়েছে।

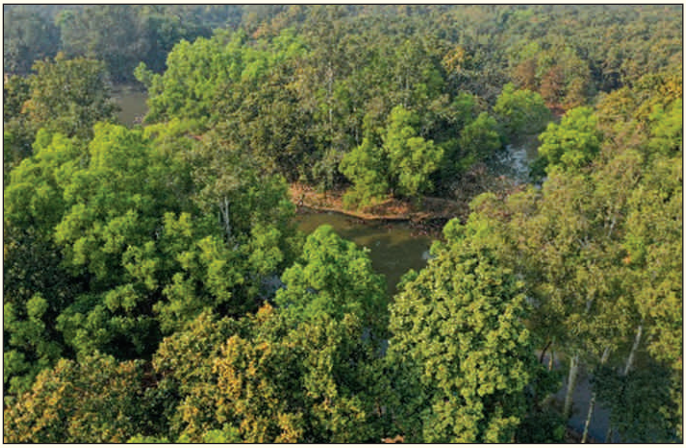

গাজীপুরের শাল বন

পরিমাণ: এ বনের আয়তন প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার হেক্টর যা দেশের আয়তনের ০.৮১% এবং বন অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত বনভূমির ৭%।

উদ্ভিদ প্রজাতি: এ বনের মূল প্রজাতি শাল (*Shorea robusta*) যা অনেকেই গজারী বলে জানেন। শুষ্ক মৌসুমে (ফেব্রুয়ারি-মার্চ) শাল গাছের পাতা ঝরে যায় বলে একে পত্রঝরা বনও বলা হয়। এ ছাড়া এ বনে হরিতকি, বহেরা, কড়ই, শিমুল, অর্জুন ইত্যাদি প্রজাতির বৃক্ষ রয়েছে।

বন্যপ্রাণী: এ বনের উল্লেখযোগ্য বন্যপ্রাণীর মধ্যে রয়েছে মেছোবাঘ, বনবিড়াল, বানর, শিয়াল, সাপ, পাখি ইত্যাদি।

প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন

অবস্থান: খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলায় অবস্থিত পৃথিবীর একক বৃহত্তম প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন হচ্ছে আমাদের সুন্দরবন। বঙ্গোপসাগরের কোল ঘেঁষে এ বন অবস্থিত।

সুন্দরবনের খাল

পরিমাণ: এ বনের আয়তন প্রায় ৬ লক্ষ ১ হাজার ৭০০ হেক্টর যা দেশের আয়তনের ৪.০৮% যা বন অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত বনভূমির ৩৮%।

উদ্ভিদ প্রজাতি: সুন্দরী, গেওয়া, গরাণ, কেওড়া, পশুর, বাইন, কাঁকড়া ইত্যাদি এ বনের প্রধান বৃক্ষ প্রজাতি।

বন্যপ্রাণী: এ বনের উল্লেখযোগ্য বন্যপ্রাণী হচ্ছে রয়েল বেঙ্গল টাইগার, হরিণ, বানর, শুকর, কুমির, অজগর ইত্যাদি।

নদী/খাল: এ বনের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত প্রধান প্রধান নদীগুলো হলো- পশুর, শিবসা, বলেশ্বর, রায়মংগল ইত্যাদি। তাছাড়া শত শত খাল এ বনের মধ্যে জালের মতো ছড়িয়ে আছে।

মৎস্য সম্পদ: শুধু বৃক্ষসম্পদ নয়, এ বন মৎস্য সম্পদেরও এক বিরাট আধার। ইলিশ, লইট্টা, ছুরি, পোয়া, রূপচাঁদা, ভেটকি, পারসে, গলদা চিংড়ি, বাগদা চিংড়ি, চিত্রা ইত্যাদি মাছ ও কাঁকড়া পাওয়া যায়।

বিশ্ব ঐতিহ্যঃ সুন্দরবনের ৩টি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য নিয়ে গঠিত ১ লক্ষ ৩৯ হাজার ৭০০ হেক্টর বনাঞ্চলকে ইউনেস্কো ১৯৯৭ সালে বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে ঘোষণা করেছে।

জলাভূমির বন

অবস্থানঃ সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলার হাওড় ও বিল জুড়ে এ বন বিস্তৃত। রাতারগুল দেশের অন্যতম একটি দৃষ্টিনন্দন জলাভূমির বন। সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট উপজেলায় এ বন অবস্থিত।

সিলেটের রাতারগুলের জলাভূমির বন

পরিমাণঃ রাতারগুলের আয়তন ২০৪.২৫ হেক্টর যা দেশের আয়তনের ০.০১%।

উদ্ভিদ প্রজাতিঃ এ বনের প্রধান বৃক্ষ প্রজাতিসমূহ হলো- হিজল, করচ, পিটালী, বরুণ ইত্যাদি। বছরের প্রায় অর্ধেক সময় এ বনের গাছ পানিতে আংশিক ডুবে থাকে।

বন্যপ্রাণীঃ বানর, মেছোবাঘ, ভোঁদড়, কাঠবিড়ালী, সাপ, পাখি ইত্যাদি।

মৎস সম্পদঃ এ বন মাছের আবাসস্থল ও প্রজননের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সৃজিত উপকূলীয় বন

অবস্থানঃ নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, ভোলা, পটুয়াখালী, বরগুনা, পিরোজপুর, চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার জেলার উপকূলীয় এলাকা। উপকূলীয় এলাকায় জেগে উঠা চরভূমিতে ১৯৬৫ সাল থেকে এ বন সৃষ্টি করা হচ্ছে। এ বনকে প্যারা বনও বলা হয়। এ বন ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের তীব্রতা হতে উপকূলীয় এলাকার জান-মাল রক্ষা করে।

উপকূলীয় বন সৃজন কার্যক্রম

সৃজিত উপকূলীয় বন

পরিমাণ: এ বনের আয়তন প্রায় ২ লক্ষ হেক্টর যা দেশের আয়তনের ১.৩৬% এবং বন অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত বনভূমির ১২% ।

উদ্ভিদ প্রজাতি: কেওড়া, ছৈলা, বাইন, গোলপাতা ইত্যাদি। প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বনের মতো এ বন জোয়ার-ভাটায় প্লাবিত হয়।

বন্যপ্রাণী: হরিণ, মেছোবাঘ, শিয়াল, বানর, বনবিড়াল, বালিহাঁস ইত্যাদি।

মৎস্য সম্পদ: এ বন উপকূলীয় মৎস্য ভান্ডারেরও একটি বিরাট উৎস। ভেটকি, পারসে, গলদা চিংড়ি, বাগদা চিংড়ি ইত্যাদি মাছ ও কাঁকড়া পাওয়া যায়।

উপকূলীয় বনায়নে অর্জিত সাফল্য

বাংলাদেশ বিশ্বে সর্বপ্রথম উপকূলীয় চরাঞ্চলে সফল বনায়নকারী দেশ। বন বিভাগ ষাটের দশক থেকে উপকূলীয় অঞ্চলে জেগে ওঠা চরে বনায়ন শুরু করেছে। উপকূলীয় চরে বনায়ন প্রক্রিয়ায় বনজ সম্পদ সৃষ্টির পাশাপাশি উপকূলবাসীকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে সুরক্ষা এবং সাগর থেকে ভূমি জেগে ওঠার প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করছে। উপকূলীয় বনায়ন বন্যপ্রাণীর অভয়াশ্রম ও মাছের প্রজনন ক্ষেত্র তৈরি করেছে।

- ❖ বনায়নের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগর থেকে ১ হাজার ৬০০ বর্গকিলোমিটার আয়তনের ভূমি দেশের মূল ভূ-খন্ডের সাথে যুক্ত হয়েছে।
- ❖ উপকূলীয় চরাঞ্চলে এ যাবৎ ২ হাজার বর্গ কি.মি. উপকূলীয় নতুন জেগে ওঠা চরে বন সৃজন করা হয়েছে, যা উপকূলবাসীকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবল থেকে রক্ষা করে আসছে।

- উপকূলীয় চর বনায়নের প্রভাবে স্থায়িত্ব অর্জন করায় উপকূলের ১ লক্ষ ১২ হাজার ৬৩ একর জমি শস্য উৎপাদনের লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয়ে ফেরৎ প্রদান করা হয়েছে।

জেলা ভিত্তিক বৃক্ষ আচ্ছাদন

যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও বন অধিদপ্তর এর যৌথ গবেষণায় ২০১৪ সালের Landsat-স্যাটেলাইট ইমেজ (Image Resolution 30m) এর তথ্য বিশ্লেষণ করে বাংলাদেশের জেলা ভিত্তিক বৃক্ষ আচ্ছাদনের পরিমাণ নিরূপণ করা হয়। নিম্নে তার তথ্য উপস্থাপন করা হল:

জেলা	বৃক্ষ আচ্ছাদন ২০১৪ (বর্গ কিঃ মিঃ)	বৃক্ষ আচ্ছাদন %	জেলা	বৃক্ষ আচ্ছাদন ২০১৪ (বর্গ কিঃ মিঃ)	বৃক্ষ আচ্ছাদন %
বাগেরহাট	২১০১.৫৫	৫০.৪৪	লালমনিরহাট	১২১.৯৯	৯.৮৪
বান্দরবান	৩৪০৩.৪৬	৭৩.৬৭	মাদারীপুর	১০৪.৫৪	৯.২৪
বরগুনা	৩০৬.৭৪	১৭.৯২	মাগুরা	১৭৫.৪৮	১৬.৮২
বরিশাল	৫৬৬.১১	২২.০৮	মানিকগঞ্জ	১৪৫.২৬	১০.৪৩
ভোলা	৬৬৩.৬৫	১৭.৫২	মৌলভীবাজার	৯০১.৩৫	৩৩.৩২
বগুড়া	২৬৭.৬০	৯.১৩	মেহেরপুর	৯০.৭৫	১২.৮৪
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১৩৪.৭২	৬.৯৪	মুন্সিগঞ্জ	৫০.২১	৫.৩৭
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	২৩৯.৮৬	১৪.৩৭	ময়মনসিংহ	৮২০.৬৮	১৮.৯৪
চাঁদপুর	৩৪১.৫১	১৯.৯৩	নওগাঁ	১৫৭.১৫	৪.৫৯
চট্টগ্রাম	১৫৭২.৭৯	২৬.৮৪	নড়াইল	১০৫.৬৯	১০.৬৯
চুয়াডাঙ্গা	১৭৫.০৯	১৫.২৩	নারায়ণগঞ্জ	৪৩.০৯	৬.০৮
কুমিল্লা	৪১৬.৬৪	১৩.৩৬	নরসিংদী	৩৩৬.৬০	২৮.৯৮
কক্সবাজার	৬১৫.৫৭	২০.২৮	নাটোর	২৬২.৯১	১৩.৮১
ঢাকা	১৬৪.৪৩	১১.১৮	নেত্রকোনা	২৫৮.৫৮	৯.২৫
দিনাজপুর	১৫০.২১	৪.৩৫	নীলফামারী	১১১.১২	৬.৯৭
ফরিদপুর	২৫০.২০	১২.৩৩	নোয়াখালী	৫৪১.৮৪	১২.৬৫
ফেনী	২০৬.৯৭	২২.৩৪	পাবনা	২৬৮.৯২	১১.৩২
গাইবান্ধা	১৮১.২৭	৮.৪৪	পঞ্চগড়	৬৪.৬৯	৪.৬৪
গাজীপুর	৬১৫.৮৩	৩৩.৯২	পটুয়াখালী	৪৬৩.০৩	১৩.৩৪
গোপালগঞ্জ	১০৬.৩৬	৭.১৮	পিরোজপুর	৪৫২.৫১	৩৫.৫৩
হবিগঞ্জ	৪২৭.৩২	১৬.৩৭	রাজবাড়ী	১৫৫.৮০	১৩.৬৬
জামালপুর	২১৮.১৯	১০.৬১	রাজশাহী	২৬৩.৫৯	১০.৮৯
যশোর	৫৮৬.৯৯	২২.৯২	রাঙ্গামাটি	৪০১৪.৩৩	৭০.২৬
ঝালকাঠি	২৬৩.৮১	৩৫.৫০	রংপুর	২৮১.৭২	১১.৯৪
ঝিনাইদহ	৩৫৫.৯৬	১৮.২১	সাতক্ষীরা	১৩৩১.৩৮	৩৩.৬১
জয়পুরহাট	৬২.৬৭	৬.৩২	শরীয়তপুর	১৩৭.৯৮	১১.৪৯
খাগড়াছড়ি	১৯৮৬.৭৬	৬৭.৩১	শেরপুর	১৭৯.৯১	১৩.৭২
খুলনা	১৮০৯.৫১	৪০.৯১	সিরাজগঞ্জ	২২১.৬৪	৮.৮৩
কিশোরগঞ্জ	৩১৬.০২	১২.৩২	সুনামগঞ্জ	১৭৩.৯৫	৪.৭৫
কুড়িগ্রাম	২৩৬.২৭	১০.৩২	সিলেট	৬০১.৮৪	১৭.৫২
কুষ্টিয়া	২৫০.৪০	১৫.৩৬	টাঙ্গাইল	৭০৯.৭১	২১.০৩
লক্ষ্মীপুর	৪৩৮.৮০	২৯.২১	ঠাকুরগাঁও	৩০.৪৯	১.৭০
বৃক্ষ আচ্ছাদনের মোট ভূমির পরিমাণ				৩৩০১২	২২.৩৭

বন অধিদপ্তরের নার্সারী

বন অধিদপ্তরের আওতায় দেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে ৬১টি জেলায় মোট ১০১টি এস,এফ,এন,টি,সি (সামাজিক বনায়ন নার্সারী ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র) এবং ৩১২টি উপজেলায় এস,এফ,পি,সি (উপজেলা সামাজিক বনায়ন কেন্দ্র) রয়েছে। বন বিভাগে বিদ্যমান এই ৪১৩টি নার্সারীতে বিভিন্ন বনজ, ফলদ, ঔষধি ও বিলুপ্তপ্রায় গাছের চারা উত্তোলন ও সরকারী মূল্যে বিক্রয় করা হয়ে থাকে। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে এসকল নার্সারীতে বিক্রয়/ বিতরণের জন্য ৬৯,৪৫,০০০টি চারা উত্তোলন করা হয়েছে। ২০০২ সাল হতে এ পর্যন্ত সারা দেশে ব্যাপক বনায়নের লক্ষ্যে বন অধিদপ্তরের বিভিন্ন নার্সারী কর্তৃক ১০ কোটি ৮৪ লক্ষ ৮৫ হাজার টি বিবিধ বনজ, ফলদ, ঔষধি ও বিলুপ্তপ্রায় গাছের চারা উত্তোলন পূর্বক বিক্রয়/বিতরণ করা হয়েছে।

সামাজিক বনায়ন

সামাজিক বনায়ন হলো স্থানীয় দরিদ্র জনগণকে উপকারভোগী হিসেবে সম্পৃক্ত করে পরিচালিত বনায়ন কার্যক্রম। ভূমিহীন, দরিদ্র, বিধবা ও দুর্দশাগ্রস্থ গ্রামীণ জনগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুবিধা নিশ্চিত করাই সামাজিক বনায়নের প্রধান লক্ষ্য। সামাজিক বনায়নের মূল উদ্দেশ্য হলো দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে তাদের স্বনির্ভর হতে সহায়তা করা এবং তাদের খাদ্য, পশুখাদ্য, জ্বালানী, আসবাবপত্র ও মূলধনের চাহিদা পূরণ করা। নার্সারী সৃজন, প্রান্তিক ও পতিত ভূমিতে বৃক্ষরোপণ করে বনজ সম্পদ সৃষ্টি, মরুময়তা রোধ, ক্ষয়িষ্ণু বনাঞ্চল রক্ষা ও উৎপাদন বৃদ্ধি,পরিবেশ উন্নয়ন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, নারীর ক্ষমতায়ন ও নেতৃত্ব সৃষ্টি এবং সর্বোপরি কর্মসংস্থান ও দারিদ্রতা নিরসনে সামাজিক বনায়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

সৃজিত কৃষি বন

আবর্তকাল ও উপকারভোগী নির্বাচন

সামাজিক বনায়নের আওতায় সৃজিত বাগানের আবর্তকাল ন্যূনতম ১০ বছর। সৃজিত স্ট্রিপ বাগানে প্রতি কিলোমিটারে সাধারণত ৫ জন এবং উডলট / ব্লক বাগান / বাফারজোন / এগ্রোফরেস্ট্রি / উপকূলীয় চরভূমি / ফোরশোর ইত্যাদি বাগানে প্রতি একরে ১ জন হিসেবে উপকারভোগী সম্পৃক্ত করা হয়। অধিকাংশ উপকারভোগী সৃজিত উডলট ও কৃষি বন বাগানে অন্তর্বর্তীকালীন ফসল হিসেবে আদা, হলুদ, আনারস, গম, চীনাবাদাম, কচু, লেবু, সবজি এবং ঔষধি গাছপালা ও অন্যান্য ফসল রোপণ করে লাভবান হয়। অংশীদারিত্বমূলক লভ্যাংশ বন্টন চুক্তিনামা অনুযায়ী সামাজিক বন থেকে প্রথম ৭ বছর পর্যন্ত প্রুনিং ও থিনিং কালে কর্তিত বৃক্ষ, ফলদবৃক্ষের ফল, উৎপাদিত কৃষি ফসল ইত্যাদি থেকে প্রাপ্ত সকল আয় সম্পূর্ণরূপে উপকারভোগীগণ পেয়ে থাকেন এবং আবর্তকাল শেষে বৃক্ষ কর্তন পূর্বক লভ্যাংশ উপকারভোগীদের মাঝে বন্টন করা হয়।

বাংলাদেশে সামাজিক বনায়ন গ্রামীণ জনপদে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। সেই সাথে সামাজিক বনায়ন পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত প্রশমন ও অভিযোজন এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বন বিভাগ ১৯৬০-এর দশকে বন সম্প্রসারণ কার্যক্রমের মাধ্যমে সর্বপ্রথম বনায়ন কর্মসূচি বনাঞ্চলের বাইরে জনগণের কাছে নিয়ে যায়। অতঃপর ১৯৮১-৮২ সাল হতে উত্তরবঙ্গের সরকারি বনভূমিতে বনায়নের জন্য বৃহত্তর ৭টি জেলায় কমিউনিটি ফরেষ্ট্রি প্রকল্পের মাধ্যমে জনগণের অংশগ্রহণে অংশীদারিত্বমূলক সামাজিক বনায়নের প্রচলন করে। সরকার ২০০০ সালে সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমকে ১৯২৭ সালের বন আইনে অন্তর্ভূক্তির মাধ্যমে আইনি কাঠামোতে নিয়ে আসে। সামাজিক বনায়নকে আরও শক্তিশালী করার জন্য সরকার ২০০৪ সালে সামাজিক বনায়ন বিধিমালা প্রবর্তন করে। এ বিধিমালা আরো যুগোপোযোগী ও কার্যকর করার লক্ষ্যে ২০১০ সালে এ সংশোধনী আনা হয়। সংশোধিত বিধিমালায় সরকারি বনভূমিতে বনায়নের জন্য স্থানীয় জনগোষ্ঠীর বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

সামাজিক বনায়নের উপকারভোগীদের মধ্যে মাননীয় মন্ত্রীর চেক প্রদান

সামাজিক বনায়নে অর্জিত সাফল্য

১. সামাজিক বনায়নের আওতায় ১৯৮১-১৯৮২ হতে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত ৯৪,৯৩৯ হেক্টর এবং ৭১,৪৫৬ কিলোমিটার বাগান সৃজন করা হয়েছে।

২. সৃজিত বাগানে ৬ লক্ষ ৭৮ হাজার ৬০১ জন উপকারভোগী সম্পৃক্ত রয়েছেন, যাদের মধ্যে মহিলা উপকারভোগীর সংখ্যা ১ লক্ষ ২৮ হাজার ৪৬৭ জন।

৩. সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে সৃজিত বাগানসমূহ হতে ৩৯,১০৫ হেক্টর এবং ১৬,২৭৬ কিলোমিটার বাগান কর্তন করা হয়েছে; যার বিক্রয়মূল্য ১০৭১ কোটি ৩৪ লক্ষ ৪৪ হাজার ২৪৫ টাকা।

৪. এযাবৎ ১ লক্ষ ৬৮ হাজার ৫৬৪ জন উপকারভোগীর মাঝে ৩৫৬ কোটি ৮২ লক্ষ ৩৪ হাজার ৫২২ টাকা বিতরন করা হয়েছে।

৫. ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত পুনঃ বনায়নের কাজে বৃক্ষরোপন তহবিলে (TFF) ১০৬ কোটি ১২ লক্ষ ৯৭ হাজার ৯৬৭ টাকা পাওয়া যায়।

৬. সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে সরকারের এযাবৎ রাজস্ব আয়ের পরিমান ৩৮৯ কোটি ১৬ লক্ষ ২৫ হাজার ৯৫৮ টাকা।

রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা এবং গুরুত্ব

বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ এর ধারা ২(৩১) অনুসারে “সহ-ব্যবস্থাপনা” অর্থ কোনো একটি এলাকার প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের মধ্যে ঐক্যমতের ভিত্তিতে উক্ত সম্পদের পরিচালনা বা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অংশীদারিত্বের মাধ্যমে সকল পক্ষের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ বুঝায়।

প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় দীর্ঘকালের চলে আসা প্রথাগত পদ্ধতির নানা দুর্বলতা দূর করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে (বিশেষতঃ উন্নয়নশীল বিশ্বে) প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষায় সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি আশার সঞ্চার করেছে এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় এ পদ্ধতি আদর্শ একটি মডেল হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। বাংলাদেশ বন বিভাগ ও ইউএসআইডি এর যৌথ উদ্যোগে নিসর্গ সহায়তা প্রকল্প (২০০৪-২০০৮) এর মাধ্যমে ৫টি রক্ষিত এলাকায়, সমন্বিত রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা প্রকল্প বা আইপ্যাক প্রকল্প (২০০৮-২০১৩) এর মাধ্যমে ১৮টি রক্ষিত এলাকায় এবং জলবায়ু-সহিষ্ণু প্রতিবেশ ও জীবিকা বা ক্রেল প্রকল্প (২০১৩-২০১৮) এর মাধ্যমে ২২টি রক্ষিত এলাকায় সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করা হয়। রক্ষিত এলাকার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং প্রতিবেশ ব্যবস্থার টেকসই উন্নয়ন ও সুশাসন নীতির ভিত্তিতে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক ন্যায় ভিত্তিক অংশীদারিত্বমূলক বন্টন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে একটি অর্জনযোগ্য পরিকল্পনা প্রণয়ন ও

সহ-ব্যবস্থাপনা দিবস ২০১৯ উপলক্ষ্যে মতবিনিময় সভা

এর সুষ্ঠু বাস্তবায়ন আবশ্যক। সহ-ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠী, সম্পদ ব্যবহারকারী ও অন্যান্য অংশীজন সরকারের পাশাপাশি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সুষ্ঠু বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বাংলাদেশের রক্ষিত এলাকা জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের পাশাপাশি বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর জীবিকায়ন, ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর বাসস্থান ও খাদ্যের উৎস, এবং দেশী-বিদেশী পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় পর্যটন এলাকা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ। উপকূলীয় জনগোষ্ঠীকে প্রাকৃতিক দূর্যোগ থেকে রক্ষা, বিপন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীকূলের আবাসস্থল এবং দেশের গুরুত্বপূর্ণ জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ এলাকা হিসেবেও রক্ষিত এলাকার গুরুত্ব অপরিসীম। জনসংখ্যাবৃদ্ধি, দারিদ্র্য, জ্বালানীকাঠ সংগ্রহ, অবৈধভাবে গাছকর্তন, বন বিভাগের পর্যাপ্ত জনবলের অভাব, গবাদি পশুর বিচরণ, বনে আগুন, এবং সর্বোপরি বনভূমি কৃষি ও জনবসতিতে পরিনত হওয়ায় বাংলাদেশের রক্ষিত এলাকা সমূহ হুমকির সম্মুখীন।

এই প্রেক্ষাপটে ২০০৩ সালে বাংলাদেশ সরকারের বনবিভাগ পাঁচটি রক্ষিত এলাকায় আটটি সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গ্রহণ করে। এর ধারাবাহিকতায়, ২০১৫ পর্যন্ত বনবিভাগ নিসর্গ সহায়তা প্রকল্প (NSP, ২০০৩-২০০৮), সমন্বিত রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (IPAC, ২০০৮-২০১৩) এবং ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইকোসিস্টেমস্ এন্ড লাইভলি হুডস্ প্রকল্প (CREL, ২০১৩-২০১৮) এর মাধ্যমে ২২টি রক্ষিত এলাকায় ২৮ টি সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করে। কিন্তু আর্থিক প্রতিবন্ধকতা, স্থানীয় প্রভাবশালী ও রাজনীতিবিদদের প্রভাব, প্রকল্প নির্ভরতা, এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর দূর্বলতার কারণে সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম এখনও আশানুরূপ ভূমিকা রাখতে পারেনি। সরকার ইতোমধ্যে রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০১৭ অনুমোদন এবং সহ-ব্যবস্থাপনার একটি পূর্নাঙ্গ রূপরেখা প্রনয়ন করেছে, যার সফল বাস্তবায়নে জীববৈচিত্র সংরক্ষণ ও বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর জীবন-মানের উন্নয়ন হবে। বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে চলমান টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল) প্রকল্প (২০১৯-২০২৩) এর আওতায় সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম শক্তিশালী করণ ও নুতন রক্ষিত এলাকায় সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশের জীববৈচিত্র সংরক্ষণে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

সামাজিক বনায়নে ও সহ-ব্যবস্থাপনায় নারীর ক্ষমতায়ন

সামাজিক বনায়নে নার্সারিতে চারা উৎপাদন, পরিচর্যা, বাগান পরিচর্যা ইত্যাদি কার্যক্রমে নারীদের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি এবং আত্মনির্ভরশীল করা হয়ে থাকে। এছাড়া সামাজিক বনায়ন বিধিমালা (২০০৪) অনুযায়ী ৩০% দুঃস্থ নারী উপকারভোগী হওয়ার সুযোগ পেয়ে

থাকেন। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উদ্যোগে গৃহীত সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের অন্ততঃ দুইজন নারী থাকেন। বিধি ৭ এর (১) উপবিধিতে চুক্তির আওতায় উপকারভোগীর দায়িত্ব, কর্মব্যবস্থাপনা এবং সুবিধা স্ত্রী ও স্বামীকে সমান অধিকার অর্পণ করা হয়েছে। সামাজিক বনায়নের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ৫০% নারীকে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়ে থাকে। রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা বিধিমালা (২০১৭) অনুযায়ী গ্রাম সংরক্ষণ দল, পিপলস্ ফোরাম, সহ-ব্যবস্থাপনা সাধারণ ও নির্বাহী কমিটির প্রতিটি পর্যায়ে এবং দাপ্তরিক পদমর্যাদায় নারীর অবস্থানকে নিশ্চিত করা হয়েছে। তাছাড়া বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রে নীতিমালা অনুযায়ী নারীদের অগ্রাধিকার দিয়ে বৃক্ষরোপণে উৎসাহিত করা হয়ে থাকে।

বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি

সরকার ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত রাস্ট্র হিসেবে বিনির্মাণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং সুশাসন সুসংহতকরণে সচেষ্ট। সে লক্ষ্য বাস্তবায়নে একটি কার্যকর, দক্ষ এবং গতিশীল প্রশাসনিক ব্যবস্থা একান্ত অপরিহার্য মর্মে সরকার মনে করে। এ পরিপ্রেক্ষিতে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ৪৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু হয়েছে। ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ৪৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের সঙ্গে বার্ষিক কর্মসংস্থান চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে মন্ত্রণালয়/বিভাগ, আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার পাশাপাশি বিভাগীয়/আঞ্চলিক ও জেলা পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের সঙ্গেও বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ৫১ টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ, আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা এবং জেলা পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের পাশাপাশি উপজেলা পর্যায়ের কার্যালয়সমূহ পর্যন্ত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বন অধিদপ্তর ২০১৪-২০১৫ অর্থবছর থেকে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে।

চলতি অর্থবছরে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন, প্রাকৃতিক বিপর্যয় রোধ এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাকল্পে বন অধিদপ্তর কর্তৃক ৩,৬৫০ হেক্টর ব্লক বাগান, ৫,০০০ হেক্টর ম্যানগ্রোভ বাগান এবং ১,৩০০ কিলোমিটার স্ট্রীপ বাগান সৃজন করা হচ্ছে। সামাজিক বনায়নে সম্পৃক্ত প্রায় ১৬,৬৪৯ জন উপকারভোগী, ভূমি মালিক সংস্থা এবং ইউনিয়ন পরিষদকে প্রায় ৪০কোটি টাকা লভ্যাংশ বিতরণ করা হচ্ছে।

টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট (এসডিজি) এবং ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্ত ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বন অধিদপ্তর সারাদেশে বৃক্ষাচ্ছাদন সম্প্রসারণের জন্য ১১,০০০ হেক্টর ব্লক বাগান, ৬,০০০ হেক্টর ম্যানগ্রোভ বাগান এবং ১৩৫০ কিলোমিটার স্ট্রীপ বাগান সৃজন করবে। বনায়নযোগ্য নূন্যতম ১০,০০০ হেক্টর এলাকার Site Specific Plan (SSP) তৈরী করা হবে এবং সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসনে উপকারভোগীসহ সংশ্লিষ্ট সংস্থার মধ্যে ৩০ কোটি টাকা লভ্যাংশ বিতরণ করা হবে। সুন্দরবনসহ অন্যান্য রক্ষিত অঞ্চলের সম্পূর্ন অংশকে SMART Patrolling এর আওতায় আনা হবে।

রক্ষিত এলাকা সমূহ

জীববৈচিত্র্য ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য সরকার ঘোষিত বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা, সকল অভয়ারণ্য, জাতীয় উদ্যান, কমিউনিটি কনজারভেশন এলাকা, সাফারী পার্ক, ইকো পার্ক, উদিভদ উদ্যান, জাতীয় ঐতিহ্য ও কুঞ্জবন- এ সকল এলাকা রক্ষিত এলাকার অন্তর্ভূক্ত। দেশে বর্তমানে রক্ষিত এলাকার (Terrestrial & Marine) পরিমাণ ৬,১৮,২৫৩.৪৯ হেক্টর যা দেশের মোট আয়তনের ৪.১৯ শতাংশ।

দেশের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে সরকার সারা দেশে সর্বমোট ৪৫টি সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা করেছে। তারমধ্যে ১৯টি জাতীয় উদ্যান, ২০টি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, ২টি বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা এবং ১টি মেরিন প্রোটেকটেড এরিয়া রয়েছে। তাছাড়া শকুন সংরক্ষণের জন্য ০২টি শকুন নিরাপদ এলাকা (ভালচার সেফ জোন) ঘোষণা করা হয়েছে।

বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যঃ

১. রেমাকালেঙ্গা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য
২. ফাসিয়াখালী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য
৩. হাজারীখিল বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য
৪. চুনতি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য
৫. টেকনাফ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য,
৬. দুধপুকুরিয়া-ধোপাছড়ি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য
৭. পাবলাখালী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য
৮. সাংগু বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য
৯. টেংরাগিরি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য
১০. সোনার চর বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য
১১. চর কুকরি-মুকরি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য
১২. সুন্দরবন পূর্ব বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য
১৩. সুন্দরবন পশ্চিম বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য
১৪. সুন্দরবন দক্ষিন বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য
১৫. চাঁদপাই বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, মংলা
১৬. দুধমুখী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, শরণখোলা
১৭. ঢাংমারী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, দাকোপ
১৮. নগরবাড়ী- মোহনগঞ্জ ডলফিন অভয়ারণ্য,
১৯. শিলন্দা নাগডেমরা বন্যপ্রাণী (ডলফিন) অভয়ারণ্য,
২০. নাজিরগঞ্জ বন্যপ্রাণী (ডলফিন) অভয়ারণ্য

জাতীয় উদ্যানঃ

১. ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান,
২. মধুপুর জাতীয় উদ্যান,
৩. রামসাগর জাতীয় উদ্যান,
৪. হিমছড়ি জাতীয় উদ্যান,
৫. লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান,
৬. কাপ্তাই জাতীয় উদ্যান,
৭. নিঝুমদ্বীপ জাতীয় উদ্যান,
৮. মেধাকচ্ছপিয়া জাতীয় উদ্যান,
৯. সাতছড়ি জাতীয় উদ্যান,
১০. খাদিম নগর জাতীয় উদ্যান,
১১. বাড়ৈয়াঢালা জাতীয় উদ্যান,
১২. কুয়াকাটা জাতীয় উদ্যান,
১৩. নবাবগঞ্জ জাতীয় উদ্যান,
১৪. সিংড়া জাতীয় উদ্যান,
১৫. কাদিগড় জাতীয় উদ্যান,
১৬. আলতা দিঘী জাতীয় উদ্যান এবং
১৭. বীরগঞ্জ জাতীয় উদ্যান।
১৮. জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যান, মিরপুর এবং
১৯. শেখ জামাল ইনানী জাতীয় উদ্যান।

বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকাঃ

১. রাতারগুল বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা
২. আলতাদীঘি বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা

ইকোপার্কঃ

১. চরমুগুরিয়া ইকোপার্ক
২. টিলাগড় ইকোপার্ক ও বন্যপ্রাণী প্রজনন কেন্দ্র
৩. মাধবকুন্ড ইকোপার্ক

মেরিনপার্কঃ

১. সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড মেরিন প্রোটেক্টেড এরিয়া

সোয়াচ অব নো-গ্রাউন্ড মেরিন প্রোটেক্টেড এরিয়া

বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন ২০১২-এর ধারা ২০ (১) এর ক্ষমতা বলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত সোয়াচ অব নো-গ্রাউন্ড মেরিন প্রোটেকক্টেড এরিয়া এর ১৭৩৮.০০ বর্গ কিলোমিটার অংশকে পাঁচ প্রজাতির বিপন্ন সামুদ্রিক ডলফিন **(ইরাবতী ডলফিন, গোলাপি ডলফিন, বোতলনাক ডলফিন, চিত্রা ডলফিন, ঘুনি ডলফিন, পাখনাহীন শুশুক, কয়েক প্রজাতির তিমি, ফিন তিমি, কুঁজো তিমি, কমন স্পার্ম তিমি, খাটো স্পার্ম তিমি, ঘাতক তিমি ইত্যাদি এবং হাঙ্গর (হাতুরী হাঙ্গর, বাঘা হাঙ্গর, বিলাই হাঙ্গর, মইচিয়া হাঙ্গর, কানি হাঙ্গর, চোখা হাঙ্গর, কালা হাঙ্গর, নীল হাঙ্গর, থুট্টি হাঙ্গর, ফৌরি হাঙ্গর, করাতি হাঙ্গর)** সংরক্ষণ ও বংশ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সোয়াচ অব নো-গ্রাউন্ড মেরিন প্রোটেকক্টেড এরিয়া হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

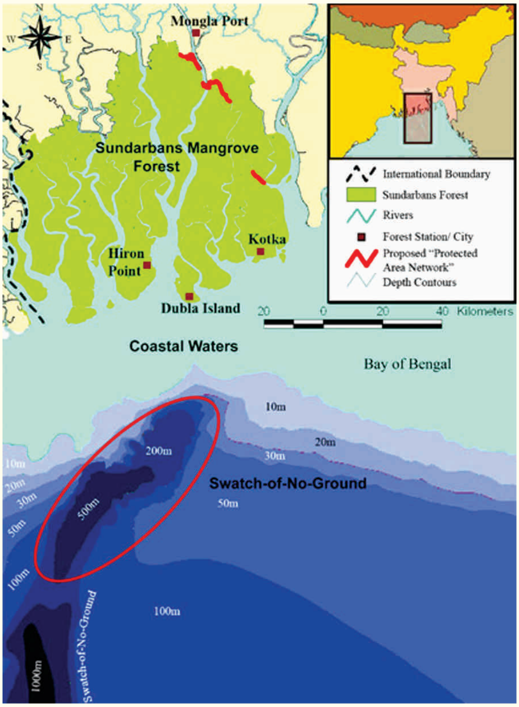

বঙ্গোপসাগরের সোয়াচ অব নো-গ্রাউন্ড

বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ

বন্যপ্রাণী ও তাদের আবাসস্থল এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনাকে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার সংবিধানে '১৮ এ' অনুচ্ছেদ যুক্ত করে দেশের বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণকে আরো বেগবান করেছে। তাছাড়া বাংলাদেশ পৃথিবীব্যাপী বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে বিভিন্ন প্রটোকল ও চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে যেমনঃ বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য সম্পর্কিত কনভেনশন (CBD), পরিযায়ী প্রজাতির সংরক্ষণ সম্পর্কিত কনভেনশন (CMS), মহাবিপদাপন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতির আন্তর্জাতিক ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত কনভেনশন (CITES) ইত্যাদি।

বাংলাদেশের বন, অভ্যন্তরীণ জলাভূমি এবং বঙ্গোপসাগরে রয়েছে বিপুল জীববৈচিত্র্যের সমাহার, রয়েছে কতিপয় বিরল ও বিপন্ন প্রজাতির বন্যপ্রাণীর অস্তিত্ব। উদ্ভিদ প্রজাতির মধ্যে বাংলাদেশে ১৯৮৮ প্রজাতির শৈবাল, ২৭৫ প্রজাতির ফানজাই, ২৪৮ প্রজাতির মস জাতীয় উদ্ভিদ, ১৯৫ প্রজাতির ফার্ন জাতীয় উদ্ভিদ, ৭ প্রজাতির নগ্নবীজি এবং ৩ হাজার ৬১১ প্রজাতির গুপ্তবীজি (২৬৩৩ প্রজাতির দ্বি-বীজপত্রী এবং ৯৮৮ প্রজাতির একবীজপত্রী) উদ্ভিদ রয়েছে।

প্রাণী জগতের মধ্যে রয়েছে ৬৫৩ প্রজাতির মাছ যার মধ্যে ২৫১ প্রজাতির মিঠাপানির মাছ এবং ৪০২ প্রজাতির লোনা পানির মাছ। রয়েছে ৭১১ প্রজাতির পাখি, ৬৩ প্রজাতির উভচর, ১৭৪ প্রজাতির সরীসৃপ এবং ১২১ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী। এছাড়াও রয়েছে ১৭৫ প্রজাতির প্রোটোজোয়া, ২৯ প্রজাতির পরিফেরা, ১০২ প্রজাতির নিডারিয়া, ১০ প্রজাতির টেনোফোরা, ৭৬ প্রজাতির রোটিফেরা, ১২৬ প্রজাতির প্লাটিহেলমেনথিস, ১৭৬ প্রজাতির নেমাটোড, ৪৭৯ প্রজাতির মোলাস্ক, ৪৬ প্রজাতির একিনোডার্মাটা এবং ৫০০০-এর অধিক আর্থ্রোপোডা।

অত্যধিক জনসংখ্যার চাপ, প্রাকৃতিক সম্পদের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার, বন উজাড়, বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল ধ্বংস, দূষণ, বন্যপ্রাণী শিকার ও হত্যার ফলে পরিবেশ ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য হুমকির মুখে। একসময় বাংলাদেশের প্রায় ১৭টি জেলায় বাঘ ছিল। কিন্তু বর্তমানে শুধুমাত্র সুন্দরবনে বাঘ সীমাবদ্ধ রয়েছে। ইতোমধ্যে হারিয়ে গেছে এক শিংওয়ালা গন্ডার, ময়ূর, বুনো গরু, বুনো মহিষ মিঠা পানির কুমিরসহ ১৩ প্রজাতির প্রাণী।

বন্যপ্রাণী দ্বারা আক্রান্ত মানুষের জান-মালের ক্ষতিপূরণ নীতিমালা

বন্যপ্রাণীর ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) আদেশ, ১৯৭৩-এর আওতায় সরকার "বন্যপ্রাণী দ্বারা আক্রান্ত মানুষের জান-মালের ক্ষতিপূরণ নীতিমালা ২০১০" প্রনয়ণ করেন। ক্ষতিপূরণের ধরন ও নির্ধারণের হার নিম্নরূপ ঃ

ক্রমিক নং	ক্ষতির ধরণ	ক্ষতিপূরণের পরিমাণ
(১)	বন্যপ্রাণীর আক্রমণে মানুষ মারা গেলে	১,০০,০০০/- (এক লক্ষ টাকা)
(২)	বন্যপ্রাণীর আক্রমণে মানুষ পঙ্গু হলে	৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার টাকা)
(৩)	গবাদি পশু, ঘর-বাড়ী, গাছপালা, ফসল ইত্যাদি সম্পদ ক্ষতিগ্রস্থ হলে	সর্বোচ্চ ২৫,০০০/-(পঁচিশ হাজার টাকা)

এ পর্যন্ত প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ

ক্র: নং	আর্থিক বৎসর	মোট ক্ষতিপূরণ প্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা	বন্যপ্রাণী আক্রান্তের সংখ্যা						বাড়িঘর ও ফসলের ক্ষতি (সংখ্যা)	মোট প্রদত্ত ক্ষতিপুরণ (লক্ষ টাকায়)
			বাঘ		হাতি		কুমির			
			পঙ্গু	নিহত	পঙ্গু	নিহত	পঙ্গু	নিহত		
১।	২০১১-১২	৪৮	৮	২২	৩	১৫	-	-	১	৪২.৫
২।	২০১২-১৩	৫২	১	১৬	১	৩১	-	২	১	৪৯.২৫
৩।	২০১৩-১৪	২১	১	৫	৩	১৬	-	-	-	২২
৪।	২০১৪-১৫	২১	-	-	৮	২০	-	১	-	২৫
৫।	২০১৫-১৬	১৯৪	১	-	৯	২৬	-	২	১৫৭	৫৯.১৯
৬।	২০১৬-১৭	৭৫	-	-	১	২৪	-	-	৫০	২৯.৫
৭।	২০১৭-১৮	৩১২	-	২	১	২০	-	-	২৮৯	৪৬.২৫
	মোট	৭২৩	১১	৪৫	২৬	১৫২	০	৫	৪৯৮	২৭৩.৬৯

বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিটঃ

বন্যপ্রাণী অপরাধ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ বন অধিদপ্তরের অধীনে ২০১২ সালে বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট গঠন করা হয়। সূচনালগ্ন হতেই সারাদেশে অবৈধভাবে বিক্রি ও পাচারকালে বন্যপ্রাণী ও ট্রফি উদ্ধার, উদ্ধারের পর বন্য এবং অনূকুল আবাসস্থলে বন্যপ্রাণী মুক্ত, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট-এর সহায়তায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে বন্যপ্রাণী, বন্যপ্রাণীর ট্রফি উদ্ধার, গোয়েন্দা নেটওয়ার্কিং- উৎস সৃষ্টি ও ডেটাবেস তৈরি, বন্যপ্রাণী সংশ্লিষ্ট অপরাধ নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে সমন্বয় ও সহযোগিতা বজায় রাখা, ই-মেইল ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে বন্যপ্রাণী সংশ্লিষ্ট অপরাধের তথ্য সংগ্রহ এবং বন্যপ্রাণী বিষয়ে শিক্ষামূলক ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে এই ইউনিট নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

০৮ ফেব্রুয়ারী, ২০১৯ ইং তারিখে গাজীপুরের নগর বাজার থেকে উদ্ধারকৃত ০৬ টি সুন্ধি কাছিম (ওজন ৩২ কেজি) পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মো: শাহাব উদ্দিন, সচিব ও প্রধান বন সংরক্ষক সহ উর্দ্ধতন কর্মকর্তারা ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানে অবমুক্ত করেন।

বন্যপ্রাণী অপরাধ নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি অত্র ইউনিট সমগ্র দেশে বন বিভাগের মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন বিভাগের আওতায় বন্যপ্রাণী অপরাধ দমনে বিভিন্ন তথ্য, উপাত্ত প্রদানসহ সামগ্রিক সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট ধারাবাহিক অভিযানের মাধ্যমে পাচার/বিক্রিকালে এ পর্যন্ত (২০১২ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৮) মোট **২৭,৩৫১টি** বন্যপ্রাণী উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে।

বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিটের কার্যক্রম:

- অবৈধ বন্যপ্রাণী শিকার, পাচার, হত্যা ও ক্রয়-বিক্রয় জনিত অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ এ বর্ণিত শাস্তির বিধান প্রয়োগ ও তা যথাযথ বাস্তবায়ন;
- অবৈধ বন্যপ্রাণীর ক্রয়-বিক্রয় রোধকল্পে সমগ্র দেশে হটস্পট (Hotspot) চিহ্নিত করা এবং সকল পয়েন্টে নিয়মিত টহল প্রদান;
- অবৈধ বন্যপ্রাণীর বাণিজ্য রোধকল্পে স্থানীয় বন্যপ্রাণীর বাজার পরিদর্শন ও অভিযান পরিচালনা করা;
- দেশব্যাপী বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের তাগিদে বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিটে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণ দেশের বিভিন্ন স্থানে বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ এর বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের লক্ষ্যে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা;
- বন্যপ্রাণীর কালোবাজারি, চোরাচালানির পথ, অপরাধ প্রবণ এলাকা সনাক্ত ও বন্যপ্রাণীর দেহাংশ পাচার রোধকল্পে নিয়মিত তথ্য সংগ্রহ;
- অবৈধ বন্যপ্রাণী ক্রয়-বিক্রয় রোধে পরিচালিত বিভিন্ন অভিযানের মাধ্যমে উদ্ধারকৃত বন্যপ্রাণী তাদের প্রাকৃতিক আবাসস্থল অথবা আবাসের উপযোগী বনাঞ্চলে অবমুক্ত করা;
- বিভিন্ন আইন-শৃখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাথে সমন্বয় সাধন করে বন্যপ্রাণী উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করা;
- আহত/অসুস্থ বন্যপ্রাণীর পরিচর্যা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা;
- দলছুট হওয়া অথবা বিভিন্ন কারণে লোকালয়ে চলে আসা বন্যপ্রাণীকে উদ্ধার করে তাদেরকে প্রাকৃতিক আবাসস্থল অথবা আবাসের উপযোগী বনাঞ্চলে অবমুক্ত করা, ইত্যাদি।

বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট কর্তৃক পরিচালিত অভিযানের সংক্ষিপ্ত তথ্য:

সাল	মোট অভিযানের সংখ্যা	উদ্ধার /জব্দকৃত বন্যপ্রাণির সংখ্যা				মোট মামলা সংখ্যা	ধৃত অপরাধির সংখ্যা
		পাখি	স্তন্যপায়ী	সরীসৃপ	ট্রফি		
২০১৮	২৪৭	২৩১০	৩৮	১৭	১৫	২৯	১৪ জন
২০১৭	১১২	২৪৫৫	১০	২০	-	০৪	০৫জন
২০১৬	১৮৫	৮১৮৯	২৯	২৪৮	৪০	৬৩	৩৪ জন
২০১৫	২৫৯	১৬৭৩	৩১	৬৬১৮	২৯৬	৫০	২৮ জন

সাল	মোট অভিযানের সংখ্যা	উদ্ধার /জব্দকৃত বন্যপ্রাণির সংখ্যা				মোট মামলা সংখ্যা	ধৃত অপরাধির সংখ্যা
		পাখি	স্তন্যপায়ী	সরীসৃপ	ট্রফি		
২০১৪	২৪০	১২৫৭	২৩	৫৪৮	৩১৭	৪৭	৩০ জন
২০১৩	১৩৭	২২৪৩	৩২	৯২	০৩	৪৬	২৮ জন
২০১২	১৪১	৯৬১	১২	৪১০	২০৫	৪৬	৩৬ জন
মোট	১৩২১	১৯০৮৮	১৭০	৭৯৩৫	৮৭৬	২৮৫	১৭৫ জন

বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট কর্তৃক পরিচালিত অভিযানের চিত্রঃ

০৫ এপ্রিল, ২০১৯ ইং তারিখ নারায়ণগঞ্জের চাষাড়া ও ফতুল্লা এবং কামরাঙ্গীরচর থেকে উদ্ধারকৃত ৩৩৬ টি বন্যপ্রাণী প্রধান বন সংরক্ষক মোহাম্মদ সফিউল আলম চৌধুরী প্রাকৃতিক পরিবেশে অবমুক্ত করেন।

৪ ডিসেম্বর, ২০১৮ ইং তারিখে বন্যপ্রাণী অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ইউনিট, ঢাকা এবং র‍্যাব সদর দপ্তর এর যৌথ অভিযানে টংঙ্গী বাজার থেকে ০১ টি বানর, ১৯টি বালিহাঁস, ৫টি পেঁচা, ১৫টি শালিখ, ৫টি ঘুঘু, ১টি কালিম, ২টি কাঠবিড়ালী এবং ৭টি টিয়া সহ মোট ৫৫টি বন্যপ্রাণী উদ্ধার করা হয়। এক জন আসামিকে ৫০০০০ টাকা অর্থদন্ড করেন র‍্যাবসদর দপ্তর এর নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট। উদ্ধারকৃত বন্যপ্রাণীগুলো ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানে অবমুক্ত করা হয়।

বন্যপ্রাণী ফরেনসিক ল্যাব

বাংলাদেশ বনবিভাগ ২০১৬ সালে ঢাকাস্থ প্রধান কার্যালয়ে বন্যপ্রাণী ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন করেছে যা বন্যপ্রাণী অপরাধ নিয়ন্ত্রণে, অপরাধ উদঘাটন, তদন্ত ও মামলা পরিচালনা করার লক্ষ্যে বন্যপ্রাণী অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ইউনিটকে সঠিক তথ্য ও দিকনির্দেশনা প্রদান করার জন্য পরিচালিত হচ্ছে। এর ফলে বাংলাদেশে বন্যপ্রানী সংরক্ষণে নতুন মাইলফলক স্থাপিত হয়েছে। এই ল্যাবরেটরি প্রয়োজনীয় আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষিত ল্যাব পার্সনেল দিয়ে সমৃদ্ধ করা হয়েছে যা দেশ এবং বিদেশে বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা সংস্থা ও আইন প্রয়োগ কারী সংস্থার সাথে বন্যপ্রাণী অপরাধ মামলার সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সহয়তা করবে। ফরেনসিক হচ্ছে প্রযুক্তির বিজ্ঞান সম্মত প্রয়োগ যা অপরাধ সনাক্তকরণের সাথে সংশ্লিষ্ট, ফৌজদারী জেনেটিক্স ব্যবহার করে, বন্যপ্রাণী অপরাধের ক্ষেত্রে শিকার এবং অপরাধীদের চিহ্নিত করার জন্য, যে জেনেটিক্স একইভাবে মানুষের অপরাধ সনাক্ত ও সমাধানের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। আমাদের বন্যপ্রাণী ফরেনসিক ল্যাবে মাইক্রোস্কোপিক বিশ্লেষণ ও কনজারভেশন জেনেটিক্স উভয় প্রযুক্তির ব্যাবহার করা হবে।

ফরেনসিক ল্যাবে কর্মরত ল্যাব পার্সনেল

ঢাকাস্থ ফরেনসিক ল্যাব

যে কোন প্রাণীর অংশ বা প্রাণী কোন দেশ থেকে এসেছে, বন্যপ্রাণী ফরেনসিক জেনেটিক্স এই সব প্রজাতি শনাক্তকরণ, উৎস, জনসংখ্যা শনাক্তকরণের জন্য কনজারভেশন জেনেটিক্স প্রযুক্তির ব্যবহার করে বন্যপ্রাণীর অপরাধ উদঘাটনে সহায়তা করবে এবং কনজারভেশন জেনেটিক্স ও আইন প্রয়োগের মধ্যে সেতুবন্ধন রূপে কাজ করছে। ফরেনসিক জেনেটিক্স প্রজাতি, উৎস এবং প্রাণী বা পশু অংশের উৎস, জনসংখ্যা ইত্যাদি মত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে, পাশাপাশি বন্দী মধ্যে উৎপাদিত বা বন্য অবস্থায় পাওয়া যায় কিনা তা সনাক্ত করতে পারে। এই ল্যাবটি আন্তর্জাতিক মানের কাজ করবে ও জিনতত্ত্বের ক্ষেত্রে ফৌজদারী প্রমাণ, হেফাজতে রাখা এবং আদালতে সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন করে বন্যপ্রানী সংরক্ষণে কনজারভেশন জেনেটিক্স গুরুত্বপূর্ণ অবদান পালন করবে।

ফরেনসিক ল্যাব এর কার্যক্রম:

- বাংলাদেশের বন্যপ্রাণীর নমুনা সংরক্ষন করা।
- অবৈধভাবে পাচারের সময় আটককৃত বন্যপ্রাণীর দেহাবশেষ বা ট্রফির প্রজাতি নির্ণয় করা।
- বন্যপ্রাণী অপরাধের সাথে যুক্ত ব্যক্তি বা অপরাধী সনাক্ত করা।
- বন্যপ্রাণী সম্পর্কিত অপরাধের মূল তথ্য উদঘাটন ও বন্যপ্রাণী আইনের সঠিক

প্রয়োগে সহায়তা করা।

- বন্যপ্রাণীর প্রজাতি নির্ণয় করা।

বাংলাদেশ ওয়াইল্ডলাইফ সেন্টারের পরিচিতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৮ক-এ রাষ্ট্র কর্তৃক জীববৈচিত্র্য, বন ও বন্যপ্রাণী, সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধানের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে বন অধিদপ্তর কর্তৃক জীববৈচিত্র্য, বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন ধরণের কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে। দেশের জীববৈচিত্র্য, বন ও বন্যপ্রাণীর আবাস্থল সংরক্ষণ খাতের সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা ও দক্ষ পরিচালনা নিশ্চিতকল্পে সংশ্লিষ্ঠ বিষয়ে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তি সৃষ্ঠি এবং মানসম্মত গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত **স্ট্রেংদেনিং রিজিওনাল কো-অপারেশন ফর ওয়াইল্ডলাইফ প্রটেকশন প্রকল্পের** মাধ্যমে গাজীপুর সদর উপজেলায় মির্জাপুর-মাস্টারবাড়ীতে সর্বাধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্মিলিত শেখ কামাল ওয়াইল্ডলাইফ সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

প্রধান ফটক

একাডেমিক ভবন

৫০০ আসন বিশিষ্ট আধুনিক মিলনায়তন

অফিসার্স ডরমেটরী

অবস্থান ও আয়তন:

ঢাকা প্রশাসনিক বিভাগের অধীন গাজীপুর জেলার গাজীপুর সদর উপজেলা ও গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ২৩ নং ওয়ার্ডের ১৮ নং আড়ইশ প্রসাদ মৌজায় বাংলাদেশ ওয়াইল্ডলাইফ সেন্টারটি

অবস্থিত। এটি গাজীপুর চৌরাস্তা থেকে উত্তরে ৭ কি.মি.দুরে ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান সংলগ্ন ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের পূর্ব পার্শে নির্মিত। এর মোট আয়তন ৬.৮ একর।

উদ্দেশ্য:

১। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য বিভিন্ন পেশাজীবী জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান।

২। বন্যপ্রাণী বিষয়ক বিজ্ঞানকে অধিক চর্চার মাধ্যমে বন্যপ্রাণী বিজ্ঞানীদের নিয়ে একটি দক্ষ গ্রুপ গঠন।

৩। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুকি মোকাবেলার লক্ষ্যে, সংরক্ষিত এলাকার ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, সুস্থ্য ইকোসিস্টেম, ইকোসিস্টেম ব্যবস্থাপনা, টেকসই জীবিকায়ন, টেকসই উন্নয়ন, সংরক্ষণের নিমিত্ত প্রজনন, প্রতিবেশগত উন্নয়ন ইত্যাদির জন্য সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, মৌলিক সুযোগ সুবিধা সৃষ্ঠি।

৪। বন্যপ্রাণী সম্পদ সমূহকে সঠিক ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মানের একটি জ্ঞান ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা যা সংরক্ষণ ও বিভিন্ন উন্নয়ন বিষয়ক নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষেত্রে উপদেশ ও পরামর্শ প্রদান করবে।

৫। বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী গবেষণা ও ব্যবস্থাপনাকে জোরদার করার লক্ষ্যে উপযুক্ত বন্যপ্রাণী বিষয়ক গবেষণা কৌশল এবং সমন্বিত আধুনিক প্রযুক্তি সমূহের উন্নয়ন সাধন।

সুযোগ সুবিধা সমূহ:

শেখ কামাল ওয়াইল্ডলাইফ সেন্টারের অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা আন্তর্জাতিক মানের। এখানে প্রশিক্ষণার্থীদের মনোরম পরিবেশে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য নিম্ন লিখিত সুবিধাদি সৃষ্টি করা হয়েছে:

১। প্রশাসনিক ভবন;
২। পর্যাপ্ত সংখ্যক শ্রেণীকক্ষ;
৩। খেলার মাঠ;
৪। ৫০০ আসন বিশিষ্ট আধুনিক মিলনায়তন;
৫। ৩৬ কক্ষবিশিষ্ট অফিসার্স ডরমেটরী;
৬। কনফারেন্স রুম;
৭। লাইব্রেরী;
৮। গবেষণাগার;
৯। জি আই এস ল্যাব;
১০। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আবাসন ব্যবস্থা;

বাংলাদেশে প্রতিবেশ পর্যটন

বর্তমান বিশ্বে প্রকৃতি পর্যটন একটি বিশাল সম্ভাবনার নাম। পৃথিবীর অনেক দেশে প্রকৃতি পর্যটন তাদের দেশীয় উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। সুজলা-সুফলা শষ্য-শ্যামলা এই বাংলাদেশেও রয়েছে প্রকৃতি পর্যটনের অপার সম্ভাবনা। আদিকাল থেকে বহু বিখ্যাত পর্যটক এই প্রকৃতির অপরূপ দৃশ্যে মুগ্ধ হয়ে এদেশে ভ্রমণে এসেছিলেন। এদেশে রয়েছে অসংখ্য পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, খাল-বিল, হাওর-বাওড় এবং বিশাল সমুদ্র। প্রকৃতি পর্যটনে জনগণের অংশীদারিত্ব থাকে এবং জনগণ প্রকৃতি পর্যটন থেকে উপকৃত হয়। বিশ্বের দীর্ঘতম কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত, মহেশখালী-সোনাদিয়া দ্বীপের ম্যানগ্রোভ বন, সেন্টমার্টিন দ্বীপ এবং টেকনাফের পাহাড় ও নদ-নদী পর্যটকের দৃষ্টি কেড়ে নেয়। সেন্টমার্টিন দ্বীপে রয়েছে বিচিত্র রকমের সামুদ্রিক কাছিম,

কোরাল, কাঁকড়াসহ বিচিত্র রকমের মাছ। কুয়াকাটায় সাগর তীরে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত উপভোগ করার বিরল সুযোগ রয়েছে। এছাড়া সোনার চরের ঝাউবন সমৃদ্ধ সমুদ্র সৈকত এবং নজরকাড়া ম্যানগ্রোভ বন পর্যটকদের দৃষ্টি কাড়ে। বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য প্রকৃতি পর্যটন স্থানসমুহের তালিকা নিম্নরূপঃ

বিছানাকান্দি

সাঙ্গু সংরক্ষিত বনাঞ্চল

কেন্দ্রীয় এলাকাঃ ভাওয়াল ন্যাশনাল পার্ক (গাজীপুর), বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক (গাজীপুর), ন্যাশনাল বোটানিক্যাল গার্ডেন (ঢাকা), বলধা গার্ডেন (ঢাকা), মধুপুর ন্যাশনাল পার্ক (টাঙ্গাইল), মধুটিলা ইকোপার্ক (শেরপুর), রাজেশপুর ইকোপার্ক (কুমিল্লা) ইত্যাদি।

সিলেট এলাকাঃ লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান, সাতছড়ি জাতীয় উদ্যান, মাধবকুন্ড ইকোপার্ক, বড়শীজোড়া ইকোপার্ক, টিলাগড় ইকোপার্ক, খাদিমনগর জাতীয় উদ্যান, জাফলং, বিছানাকান্দি, লালাখাল, হাকালুকী হাওড়, টাঙ্গুয়ার হাওড় ইত্যাদি।

চট্টগ্রাম এলাকাঃ সীতাকুন্ড বোটানিক্যাল গার্ডেন এন্ড ইকোপার্ক, বাঁশখালী ইকোপার্ক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক (কক্সবাজার), বারৈয়াঢালা জাতীয় উদ্যান, শেখ রাশেল এ্যাভিয়ারী এন্ড ইকোর্পাক, ফয়েজ লেক, পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকত, কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত, হিমছড়ি, টেকনাফ, মহেশখালী দ্বীপের সোনাদিয়া ম্যানগ্রোভ বন, সেন্টমার্টিন দ্বীপ ইত্যাদি।

পার্বত্য এলাকাঃ কাপ্তাই ন্যাশনাল পার্ক, কাপ্তাই লেক, রামপাহাড়, সীতা পাহাড়, শুভলং ঝরনা, মাথিনের কুপ, আলুটিলা গুহা, বান্দরবানের চিম্বুক পাহাড়, মেঘলা পর্যটন কেন্দ্র, শৈল প্রপাত ইত্যাদি।

উত্তরাঞ্চলঃ রামসাগর জাতীয় উদ্যান, নবাবগঞ্জ জাতীয় উদ্যান, সিংড়া জাতীয় উদ্যান, বীরগঞ্জ জাতীয় উদ্যান, বঙ্গবন্ধু সেতু ইকোপার্ক, আলতাদীঘি জাতীয় উদ্যান ইত্যাদি ।

দক্ষিণাঞ্চলঃ কুয়াকাটা জাতীয় উদ্যান, নিঝুম দ্বীপ জাতীয় উদ্যান, পিরোজপুর রিভারভিউ ইকোপার্ক ইত্যাদি।

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলঃ বিশ্ব ঐতিহ্য সুন্দরবনের কটকা, হিরন পয়েন্ট, দুবলারচর, কচিখালী, হাড়বাড়িয়া এবং করমজল জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ আকর্ষণীয় পর্যটন স্পট। এখানে রয়েছে রয়েল বেঙ্গল টাইগার, চিত্রা হরিণ, লোনা পানির কুমির, ডলফিনসহ বিচিত্র রকমের জীবজন্তু।

ইকোপার্ক

ইকো-পার্ক হলো উন্মুক্ত সবুজ স্থান যেখানে প্রাকৃতিক পরিবেশ-এর সৌন্দর্য বর্ধনের সাথে সাথে জীববৈচিত্র্যও সমৃদ্ধ থাকবে, প্রকৃতি সংরক্ষণ এবং টেকসই ব্যবস্থাপনা বিষয়ে শিক্ষা ও গবেষণামূলক কার্যক্রমের সুযোগ-সুবিধা থাকবে এবং স্থানীয় জনসাধারণের বিকল্প কর্মসংস্থানের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের সুযোগ থাকবে। উদ্ভিদ ও প্রাণীর স্বাভাবিক প্রাকৃতিক (ecological) আবাসস্থল ও নয়নাভিরাম দৃশ্য সম্বলিত এলাকা যেখানে পর্যটকদের চিত্ত বিনোদনের সুযোগ-সুবিধাদি সৃষ্টির লক্ষ্যে বন ব্যবস্থাপনা করা হয়।

ক্রমিক নং	ইকো পার্ক	অবস্থান (উপজেলা/জেলা)	আয়তন (হেক্টর)	প্রতিষ্ঠাকাল
১.	সীতাকুন্ড ইকোপার্ক	সীতাকুন্ড / চট্টগ্রাম	৮০৮.০০	১৯৯৮
২.	মধুটিলা ইকোপার্ক	নালিতাবাড়ী / শেরপুর	১০০.০০	১৯৯৯
৩.	মাধবকুন্ড ইকোপার্ক	বড়লেখা / মৌলভীবাজার	২৬৬.০০	২০০১
৪.	বাঁশখালী ইকোপার্ক	বাঁশখালী / চট্টগ্রাম	১২০০.০০	২০০৩
৫.	কুয়াকাটা ইকোপার্ক	কলাপাড়া/পটুয়াখালী	৫৬৬১.০০	২০০৫
৬.	টিলাগড় ইকোপার্ক	সিলেট	৪৫৩৪.০০	২০০৬
৭.	বড়শীজোড়া ইকোপার্ক	মৌলভীবাজার	৩২৬.০৭	২০০৬
৮.	যমুনা ইকোপার্ক	পাবনা জেলার বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিমপাড় গাইড বাঁধে অবস্থিত	৫০.০২	২০০৮
৯.	পিরোজপুর রিভার ভিউ ইকোপার্ক	সদর / পিরোজপুর	২.৫৪	২০১০
১০.	শেখ রাসেল এভিয়ারী এন্ড ইকোপার্ক	রাংগুনিয়া/ চট্টগ্রাম	২১০.০০	২০১৪
১১.	চর মুগুরিয়া	মাদারীপুর	৪.২০	২০১৫

প্রকৃতি পর্যটন উপভোগ সংক্রান্ত কিছু নিয়ম কানুন পালনের নির্দেশিকা:

কি কি কাজ করা উচিত	কি কি কাজ করা উচিত নয়
১) যে জায়গায় ভ্রমণে যাবেন সে জায়গার নিয়ম-কানুন মেনে চলা, যেমনঃ প্রবেশ পার্কিং ফি থাকলে প্রবেশ ফি/পার্কিং ফি দিয়ে প্রবেশ করা।	১) বনাঞ্চল ও বন্যপ্রাণির ক্ষতি হয় এমন কোন কাজ না করা।
২) নির্দিষ্ট ডাস্টবিনে আবর্জনা ফেলা।	২) যত্র-তত্র আবর্জনা না ফেলা।
৩) নির্দিষ্ট ট্রেইলে ভ্রমণ করা।	৩) রক্ষিত বনাঞ্চল, নদী, সাগর ও জলাশয়ে কোন ধরনের অপচনশীল দ্রব্যাদি না ফেলা।
৪) প্রয়োজনে ইকো-ট্যুর গাইড নিয়ে ভ্রমণ করা।	৪) উচ্চস্বরে মাইক ও হর্ণ না বাজানো।
৫) যে এলাকায় ভ্রমণ করা হয় এর আশেপাশের জনগণের মূল্যবোধকে সম্মান জানানো।	৫) হৈচৈ, চিৎকার- চেঁচামেচি না করা।

সাফারী পার্ক

যেখানে দেশী-বিদেশী বন্যপ্রাণীসমূহ প্রাকৃতিক পরিবেশে রক্ষিত অবস্থায় থেকে বংশ বৃদ্ধির সুযোগ পায় এবং উম্মুক্ত অবস্থায় বিচরণ করে। বিরল, বিলুপ্তপ্রায় এবং মহাবিপদাপন্ন বন্যপ্রাণীদের সাফারী পার্কের ভিতরে (in-situ) এবং বাইরে (ex-situ) মূল আবাসস্থলে সংরক্ষণ, প্রজনন, বংশবৃদ্ধি; আহত ও দলছুট বন্যপ্রাণীর চিকিৎসা প্রদান; জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং ইকো-ট্যুরিজমের উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে সাফারী পার্ক গঠিত হয়। বাংলাদেশে সাফারী পার্ক মোট ২টি।

১. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, কক্সবাজার
২. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, গাজীপুর

এক নজরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, কক্সবাজার

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক বাংলাদেশের প্রথম সাফারী পার্ক। এটি কক্সবাজার জেলার অন্তর্গত চকোরিয়া উপজেলার ডুলাহাজরায় অবস্থিত। ১৯৮২ সালে ৪৩.০০ হেক্টর জমির উপর হরিণ প্রজনন কেন্দ্র হিসেবে যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৯ সালে ডুলাহাজরা ও হারগজা ব্লকের ৯০০ হেক্টর বনাঞ্চল নিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ২০০০-২০০১ অর্থবছর হতে সাফারী পাকের্র উন্নয়নমূলক কার্যক্রম শুরু হয়। সাফারী পার্কটি বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে গৃহীত মননশীল ও সফল পদক্ষেপসমূহের মধ্যে সময়োপযোগী একটি পদক্ষেপ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্কের বেষ্টনীতে আবদ্ধ বন্যপ্রাণীর মধ্যে স্তন্যপায়ী প্রাণী ১৩৬ টি, পাখি ৯৫ টি, সরীসৃপ ৯৭ টি ইত্যাদি।

কালো মাথার কাস্তেচরা

পিগ টেইল বানর

সাফারী পার্ক ব্যবস্থাপনার মূল উদ্দেশ্যগুলো হল-

১) প্রকৃতি হতে বিলুপ্ত, অতিবিপন্ন, বিপন্ন ও দুর্লভ প্রজাতির বন্যপ্রাণীর প্রজনন সুযোগ সৃষ্টি
২) বন্যপ্রাণী বিষয়ক গবেষণা
৩) পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষা ও
৪) পরিবেশ বান্ধব পর্যটন সুবিধা বৃদ্ধি।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, কক্সবাজার এ ইতোমধ্যে নিম্নলিখিত প্রাণীসমূহের প্রজননে সফলতা পাওয়া গেছে-

শ্রেণী	প্রজাতির নাম	বাচ্চার সংখ্যা	সংরক্ষণ অবস্থা
স্তন্যপায়ী	কালো ভাল্লুক	২	অতিবিপন্ন (আই.ইউ.সি.এন রেড লিস্ট, বি.ডি.-২০১৫)
	রয়েল বেঙ্গল টাইগার	২	অতিবিপন্ন (আই.ইউ.সি.এন রেড লিস্ট, বি.ডি.-২০১৫)
	সিংহ	৫	বিপন্ন (আই.ইউ.সি.এন)
	জলহস্তি	৫	বিপদাপন্ন (আই.ইউ.সি.এন)
	ওয়াইল্ড বিষ্ট	৩	কম ঝুঁকিপূর্ণ (আই.ইউ.সি.এন)
	প্যারা হরিণ	৩	অতিবিপন্ন (আই.ইউ.সি.এন রেড লিস্ট, বি.ডি.-২০১৫)
পাখি	ময়ূর	৪	বাংলাদেশ হতে বিলুপ্ত (আই.ইউ.সি.এন রেড লিস্ট, বি.ডি.-২০১৫)
সরীসৃপ	লোনা পানির কুমির	২০	বিপন্ন (আই.ইউ.সি.এন রেড লিস্ট, বি.ডি.-২০১৫)

সাফারী পার্ক দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের জন্য একটি আর্দশ গবেষণা ক্ষেত্র। পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান, প্রাণীবিদ্যা, পরিবেশ বিজ্ঞান, মৃত্তিকা বিজ্ঞান, বন ও উদ্ভিদ বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীরা তাদের গবেষণার কাজে অত্র পার্কে আসেন। সারাদেশের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, কক্সবাজার একটি মাঠ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। এখানে প্রতিবছর অনেক শিক্ষার্থী শিক্ষা সফরে আসেন। শিক্ষা সফরে আগত প্রতিটি শিক্ষার্থী দলকে ১জন দক্ষ কর্মকর্তার নেতৃত্বে পার্কে ভ্রমণের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া শিক্ষার্থীদের জন্য পরিবেশ শিক্ষার সুবিধার্থে রয়েছে শিক্ষামূলক ডকুমেন্টারি,তথ্য ও শিক্ষাকেন্দ্র,বন্যপ্রাণী মিউজিয়াম,এবং প্রকৃতি বীক্ষণ কেন্দ্র।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, কক্সবাজার এ পরিবেশ বান্ধব পর্যটনের বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধার উন্নয়নের পাশাপাশি পার্কটিকে দর্শনার্থীদের কাছে আরো আকর্ষনীয় ও দৃষ্টিনন্দন করার লক্ষ্যে দেশী-বিদেশী পরামর্শক এর সহযোগীতায় একটি আধুনিক ও যুগোপযোগী মাষ্টারপ্ল্যান প্রনয়ন করা হয়। অনুমোদিত মাস্টারপ্ল্যান এর আলোকে এবং আধুনিক সাফারী পার্ক তৈরীর ধ্যান ধারনাকে সামনে রেখে ২০১৭-১৮ হতে ২০১৯-২০ অর্থ বছর পর্যন্ত ৩ (তিন) বছর মেয়াদী “বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, কক্সবাজার এর অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্প” নামে নতুন একটি প্রকল্প প্রস্তাবনা দাখিল করা হয়েছে। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ভবিষ্যতে “বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, কক্সবাজার এর নান্দনিক সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির পাশাপাশি পরিবেশ বান্ধব পর্যটনের বহুমুখী সুযোগ-সুবিধাসহ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, শিক্ষা ও গবেষণা ক্ষেত্রে অপার সম্ভাবনা আশা করা যাচ্ছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, গাজীপুরঃ

চিড়িয়াখানায় জীবজন্তুসমূহ আবদ্ধ অবস্থায় থাকে এবং দর্শনার্থীগণ মুক্ত অবস্থায় থেকে জীবজন্তু পরিদর্শন করেন। কিন্তু সাফারী পার্কে বন্যপ্রাণীসমূহ উন্মুক্ত অবস্থায় বনজঙ্গলে বিচরণ করে এবং মানুষ সতর্কতার সহিত চলমান যানবাহনে আবদ্ধ অবস্থায় জীবজন্তুসমূহ পরিদর্শন করে থাকে।

ঢাকা থেকে প্রায় ৪৮ কিলোমিটার উত্তরে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের বাঘের বাজার থেকে প্রায় ৩ কিলোমিটার পশ্চিমে সাফারী পার্কটির অবস্থান। ভাওয়াল গড়ের শালবন একসময় জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ ছিল কিন্তু ইতোমধ্যে অনেক প্রাণী ও গাছপালা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। গাজীপুর জেলার শ্রীপুর

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, গাজীপুরের প্রবেশ দ্বার

উপজেলাধীন মাওনা ইউনিয়নের বড় রাথুরা মৌজা ও সদর উপজেলার পিরুজালী ইউনিয়নের পিরুজালী মৌজার খন্ড খন্ড শাল বনের ৪৯০৯.০ একর বনভূমি ছোট বড় বিভিন্ন প্রজাতির বন্যপ্রাণীর জন্য নিরাপদ আবাসস্থল হিসাবে পরিচিত। এর মধ্যে ৩৬৯০.০ একর এলাকাকে সাফারী পার্কের মাস্টার প্ল্যানের আওতাভূক্ত করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক শীর্ষক প্রকল্পটি ২০১১ সালে কার্যক্রম শুরু হয় এবং ২০১৭ সালে শেষ হয়। সাফারী পার্কটি দক্ষিণ এশীয় মডেল বিশেষ করে থাইল্যান্ডের সাফারী ওয়ার্ল্ড (Safari World) এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্থাপন করা হয়েছে। সাফারী পার্কের চারদিকে নির্মান করা হয়েছে স্থায়ী ঘেরা এবং উহার মধ্যে দেশী/বিদেশী বন্যপ্রাণীর বংশবৃদ্ধি ও অবাধ বিচরণের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে পর্যটকগণ চলমান যানবাহনে অথবা পায়ে হেঁটে ভ্রমন করে শিক্ষা, গবেষণা ও চিত্তবিনোদনের সুযোগ লাভ করতে পারবেন। সাফারী পার্কের ধারণা চিড়িয়াখানা হতে ভিন্নতর।

সাফারী পার্কের মূল উদ্দেশ্য

১। শাল বনের বন্যপ্রাণী ও উদ্ভিদ বৈচিত্র্য সংরক্ষণ;

২। বাংলাদেশের বিরল ও বিলুপ্ত প্রায় বন্যপ্রাণীকে নিজ আবাসস্থলে (in-situ) এবং আবাসস্থলের বাহিরে (ex-situ) সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সাধন;

৩। ঢাকা মহানগরীর অতি নিকটে ইকো-ট্যুরিজমের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে পর্যটন শিল্পের বিকাশ, দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা;

৪। শালবনের বন্যপ্রাণী যেমন বানর, মায়া হরিণ, বেজী, বনরুই, বাঘদাস, বন বিড়াল, খরগোশ, শিয়াল, খেকশিয়াল ও অজগরসহ বিপন্ন বন্যপ্রাণীর নিরাপদ আবাসস্থল সৃষ্টি ও সংরক্ষন করা;

৫। এছাড়া বাঘ, সিংহ, সাম্বার হরিণ, মায়া হরিণ, চিত্রা হরিণ, প্যারা হরিণ এবং অন্যান্য তৃণভোজী বন্যপ্রাণীর প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও বংশবৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করা;

৬। গন্ডার, এশীয় হাতী, পারিযায়ী পাখী, জলজ পাখী, কালো ভাল্লুক, মিঠা পানির কুমির, লোনা পানির কুমির, নীল গাই, জলহস্তী ইত্যাদি বিপন্ন ও বিলুপ্ত বন্যপ্রাণীর প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ;

৭। আহত ও উদ্ধারকৃত বন্যপ্রাণীর চিকিৎসার নিমিত্তে বন্যপ্রাণীর সেবাশ্রম ও হাসপাতাল স্থাপন;
৮। বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ সংক্রান্ত শিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করা।

সাফারী পার্কে দর্শনীয় স্থান ও বেষ্টনী

১। কোর সাফারী পার্ক (Core Safari Park)
২। বাঘ সাফারী
৩। আফ্রিকান সাফারী
৪। সাদা সিংহ সাফারী
৫। সিংহ সাফারী
৬। হরিণ সাফারী
৭। প্রজাপতি গার্ডেন
৮। ফেন্সি কার্প গার্ডেন
৯। ন্যাচারহিস্ট্রি মিউজিয়াম
১০। ফোয়ারা
১১। তথ্য ও শিক্ষা কেন্দ্র
১২। ঝুলন্ত সেতু
১৩। ম্যাকাউ ল্যান্ড
১৪। 9-D Show
১৫। পর্যবেক্ষণ টাওয়ার
১৬। সিংহ পর্যবেক্ষণ রেস্তোরা
১৭। বাঘ পর্যবেক্ষণ রেস্তোরা
১৮। কচ্ছপ ও কাছিম ব্রিডিং সেন্টার
১৯। লিজার্ড পাক
২০। ফেন্সি ডার্ক গার্ডেন
২১। ইকো রিসোর্ট
২২। ক্রাউন ফিজেন্ট পাখীশালা
২৩। ধনেশ পাখীশালা
২৪। টিয়া/তোতা পাখীশালা
২৫। কুমির বেস্টনী
২৬। পাখি দ্বীপ
২৭। অর্কিড হাউজ
২৮। শকুন পূনর্বাসন কেন্দ্র
২৯। প্রকৃতি বীক্ষণ কেন্দ্র
৩০। শিশু পার্ক ইত্যাদি

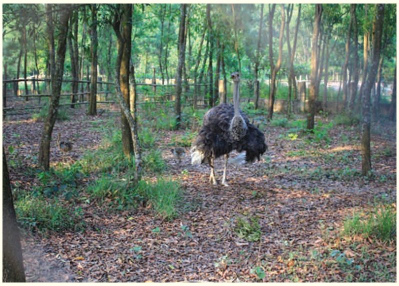
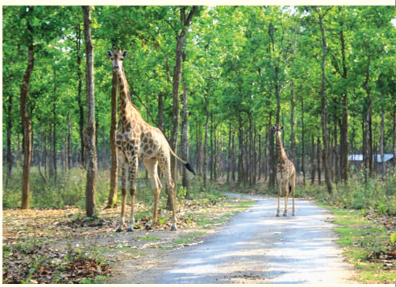

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্কের প্রাণীসমূহ:

১. বেঙ্গল টাইগার
২. আফ্রিকান লায়ন
৩. সাদা সিংহ
৪. জাগুয়ার
৫. জিরাফ
৬. জেব্রা
৭. নীল ওয়াইল্ড বিস্ট
৮. কালো ওয়াইল্ড বিস্ট
৯. ওরিক্স
১০. ব্লেস বাক
১১. থমসনস গ্যাজল
১২. জলহস্তী
১৩. আলপাকা
১৪. ছোট ঘোড়া
১৫. লাল ক্যাঙ্গারু
১৬. নীয়ালা
১৭. কমন ইল্যান্ড
১৮. চিত্রা হরিণ
১৯. মায়া হরিণ
২০. সাম্বার হরিণ
২১. গাউর
২২. এশিয়ান হাতি
২৩. এশিয়ান কালো ভাল্লুক
২৪. সবুজ পাখা ম্যাকাও
২৫. নীল ও সোনালী ম্যাকাও
২৬. মিউটেশন রিং নেক প্যারট
২৭. রিং নেক প্যারট
২৮. সান প্যারাকিট
২৯. জানদায়া প্যারাকিট
৩০. আফ্রিকান গ্রে প্যারট
৩১. ভাসা প্যারট
৩২. মন্‌ক প্যারট
৩৩. ঝুলন্ত তোতা
৩৪. সেনেগাল প্যারট
৩৫. ব্ল্যাক ক্যাপড কনুর
৩৬. রেড লরি
৩৭. প্ল্যাম হেডেড প্যারট
৩৮. চেটারিং লরি
৩৯. লেসার সালফার
৪০. গফিন
৪১. মিউট সোয়ান
৪২. ব্ল্যাক সোয়ান
৪৩. মান্দারিন হাঁস
৪৪. করোলিনা ডাক
৪৫. গ্রেটার ফ্লেমিংগো

৪৬. গ্রেট হোয়াইট পেলিকান
৪৭. গ্রে ক্রাউন সারস
৪৮. ইন্ডিয়ান নীল ময়ূর
৪৯. সাদা ময়ূর
৫০. সিলভার ফিজেন্ট(মথুরা)
৫১. গোল্ডেন ফিজেন্ট
৫২. পারপেল মুরহেন
৫৩. ইমু
৫৪. অস্ট্রিস
৫৫. রাজ ধনেশ
৫৬. পাইড হর্ণবিল
৫৭. পাতাঠুঁটি ধনেশ
৫৮. ছোট মদনটাক
৫৯. ঈগল
৬০. চিল
৬১. হিমালয়ী গ্রিধিনি ভালচার
৬২. কার্প ফিশ
৬৩. একুরিয়াম ফিশ
৬৪. মিঠাপানির কুমির
৬৫. লোনাপানির কুমির
৬৬. ঘড়িয়াল
৬৭. অজগর
৬৮. মারমোসেট মাংকি
৬৯. সুন্দি কাছিম
৭০. ধুম কাছিম
৭১. হলুদ কাইট্টা
৭২. হলুদ পাহাড়ি কচ্ছপ
৭৩. স্টার টরটয়েজ
৭৪. কালা চিত্রা কাছিম
৭৫. কড়ি কাইট্টা
৭৬. শিলা কচ্ছপ
৭৭. সিলেটি কড়ি কাইট্টা।

জলবায়ু পরিবর্তন-প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ

ভৌগোলিক অবস্থানগত কারনে বাংলাদেশ জলবায়ূ পরিবর্তনের শিকার এবং ক্ষতিগ্রস্থ অন্যতম দেশ। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বন্যা, খরা, সামুদ্রিক ঝড়, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাংলাদেশের ইতিহাসে নতুন কোনো ঘটনা নয়। কিন্তু বিশ্বজুড়ে নগরায়ন, শিল্পবিপ্লব, নির্বিচারে বন নিধন ইত্যাদি অনিয়ন্ত্রিত কর্মকাণ্ডে পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব প্রাকৃতিক দুর্যোগের ব্যাপ্তি, প্রকোপ ও আবর্তকালে জনপদকে আরও ঝুঁকিপূর্ণ করেছে। সে সাথে যোগ হয়েছে প্রাকৃতিক দুর্যোগের নতুনমাত্রা যেমন- জলাবদ্ধতা, মরুময়তা, উপকূলীয় অঞ্চলের প্রায় ১৮ শতাংশ সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা, উপকূলীয় অঞ্চলে কৃষিজমির লবণাক্ততা বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি খাদ্য নিরাপত্তার জন্য হুমকি। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগের চরম ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর অন্যতম। বাংলাদেশকে এ জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী করা না গেলেও এ দেশ জলবায়ু পরিবর্তনে সৃষ্ট বিরূপ প্রভাবের নির্মম শিকার। সরকার এ সমস্যা মোকাবেলায় ইতোমধ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে; যেমন- প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্বাভাস সম্প্রচার, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র স্থাপন, উপকূলীয় এলাকায় বসবাসকারী মানুষকে যথাসময়ে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর, দ্রুত ত্রাণ সামগ্রী সরবরাহ, উপকূলীয় বাঁধ তৈরী,বাঁধ ও বাঁধ সংলগ্ন চর এলাকায় বনায়নের মাধ্যমে সবুজ বেষ্টনী সৃষ্টি। কিন্তু নতুন মাত্রার প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব নিরসনে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তন গ্রহণযোগ্য মাত্রায় রাখতে ও এর বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় ১৯৯২ সনে স্বাক্ষরিত জাতিসংঘের কাঠামোগত কনভেনশন UNFCCC এবং এর আওতায় প্রণীত কিয়োটো প্রটোকল অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী উন্নত দেশসমূহ উন্নয়নশীল ও পরিবর্তিত অর্থনীতির দেশসমূহকে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদানের আশ্বাস দিলেও তা খুব একটা আশানুরূপভাবে বাস্তবায়ন হয়নি। তাই উন্নয়নশীল দেশ ও পরিবর্তিত অর্থনীতির দেশসমূহ উন্নত দেশসমূহকে তাদের সহায়তার আশ্বাসকে আইনী কাঠামোতে অন্তর্ভূক্তির জন্য জোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। ২০২০ সালের মধ্যেই এ ধরনের আইনী কাঠামো গঠন করা সম্ভব হবে বলে

সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞগণ আশা প্রকাশ করেছেন। প্রাকৃতিক দূর্যোগ রোধে উপকূলে জেগে ওঠা চর বনায়নের মাধ্যমে সবুজ বেষ্টনী স্থাপনের লক্ষ্যে ৫১২ কি.মি. এলাকাজুড়ে আগামী ৫ বছরে প্রস্তাবিত "Coastal Afforestation in Newly Accreted Chars of Bay of Bengal" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্রায় ২৫০০০ হেঃ ম্যানগ্রোভ বাগান সৃজনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়।

UN-REDD বাংলাদেশ জাতীয় কর্মসূচি

UN-REDD কর্মসূচি হলো জাতিসংঘের তিনটি (FAO, UNDP, UNEP) সংস্থার একটি সমন্বিত কর্মসূচি যা উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বন উজাড় ও বন অবক্ষয়ের কারণে সৃষ্ট কার্বন নিঃসরণ কমানোর কার্যক্রমকে সহযোগিতা প্রদান করে থাকে। জাতিসংঘের এই কার্যক্রমের ইংরেজি আদ্যক্ষর মিলিয়ে (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) REDD বলা হয়। অপরদিকে কার্বন নিঃসরণ কমানোর পাশাপাশি বায়ুমন্ডল থেকে কার্বন অপসারণের জন্য বনের মজুদ কার্বন সংরক্ষণ, বনের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও বন কার্বনের মজুদ বৃদ্ধির মত আরো তিনটি অতিরিক্ত কার্যক্রমকে "+" দিয়ে প্রকাশ করে একসাথে REDD+ বলা হয়।

"UN-REDD বাংলাদেশ জাতীয় কর্মসূচি" পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীন বন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত সমন্বীত একটি কার্যক্রম যা UNDP এবং FAO এর সার্বিক সহযোগিতায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০১৬ সালের জুন মাসে অনুমোদিত এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হলো: (১) বাংলাদেশে REDD+ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সকল অংশীজনের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং তাদের REDD+ বাস্তবায়ন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা (২) জাতীয় REDD+ কৌশল প্রণয়ন করা (৩) দেশের বন থেকে কার্বন নিঃসরণের একটি জাতীয় মাপকাঠি নির্ধারণ করা এবং (৪) জাতীয় বন পরিবীক্ষণ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা।

১. **অংশীজনের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং REDD+ কার্যক্রমে সম্পৃক্তকরণ:** এ কার্যক্রমের আওতায় সংশ্লিষ্ট অংশীজনসমূহ চিহ্নিত করে তাদের মধ্যে তৈরীকৃত REDD+ সংক্রান্ত তথ্যসমৃদ্ধ বিভিন্ন ধরণের পুস্তিকা বিতরণ করা হয়। পাশাপাশি অংশীজনের অংশগ্রহণে আলোচনা সভা, মত বিনিময় ও কমিউনিটি ভিত্তিক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় এবং তাদের দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়া সকল অংশীজনের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন কমিটি গঠনের মাধ্যমে তাদের মতামত প্রদানের এবং একসাথে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

২. **জাতীয় REDD+ কৌশল প্রণয়ন:** Deforestation and Forest Degradation গবেষণা প্রতিবেনটির মাধ্যমে বাংলাদেশের বন উজাড় ও বন অবক্ষয়ের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কারণগুলো সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। পরবর্তিতে এই গবেষণার আলোকে বাংলাদেশে বন উজাড় ও বন অবক্ষয় রোধে কি ধরণের নীতিমালা ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় সে বিষয়ে দেশের বন সমৃদ্ধ বেশ কয়েকটি জেলায় আবারও সংশ্লিষ্ট অংশীজনের অংশগ্রহণে আলোচনা ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসব আলোচনার ভিত্তিতে তৈরী করা হয় নীতিমালা ও পদক্ষেপ (Policy and Measures) বিষয়ক একটি প্রতিবেদন। প্রস্তুতকৃত এসব প্রতিবেদনের আলোকে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ জাতীয় REDD+ কৌশলের খসড়া প্রস্তত হয়েছে। এ বৎসরে বাংলাদেশ জাতীয় REDD+ কৌশল চূড়ান্ত করা হয়েছে।

৩. **বন থেকে কার্বন নিঃসরণের একটি জাতীয় মাপকাঠি নির্ধারণ:** দেশে প্রাথমিক ভাবে বন খাত হতে কার্বন নিঃসরণ এবং অপসারণ মাপকাঠি নিরুপন করা হয়েছে যা জাতীয় কর্মশালার মাধ্যমে সকল অংশীজনের মতামত গ্রহণের জন্য উপস্থাপন করা হয়েছে। কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামতের উপর ভিত্তি করে প্রতিবেদনটিকে অধিকতর সমৃদ্ধ করে ২০১৯ সালের জানুয়ারী মাসে চুড়ান্ত মাপকাঠিটি UNFCCC তে পাঠানো হয়। বর্তমানে এর কারিগরী মূল্যায়ন করা হচ্ছে এবং এ বৎসরের শেষ ভাগে অনুমোদিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

৪. **জাতীয় বন পরিবীক্ষণ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা:** বন উজাড় ও বন অবক্ষয় রোধের মাধ্যমে কার্বন নিঃসরণ কমানোর উদ্দেশ্যে ভৌগলিক তথ্য ব্যবস্থা (GIS), দূর অনুধাবন (remote sensing) ও ভূমি ভিত্তিক বন জরিপ ব্যবস্থার সমন্বয়ে বন হতে নিঃসরিত কার্বন এবং বনের কারণে বায়ুমন্ডলের কার্বন অপসারণ, বন কার্বন মজুদ এবং বন এলাকার পরিবর্তন মূল্যায়নের জন্য বাংলাদেশ জাতীয় বন পরিবীক্ষণ পদ্ধতি প্রণয়ন করা হয়েছে। জাতীয় বন পরিবীক্ষণ পদ্ধতির প্রণয়নের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ ইতমধ্যে একটি জিও- পোর্টাল প্রস্তুত করেছে যেখানে বন সর্ম্পকিত সকল তথ্য সন্নিবেশীত রয়েছে।

REDD+ বাস্তবায়নে নীতিমালা ও কৌশল প্রণয়নের জাতীয় কর্মশালা

বন সেক্টরে সাম্প্রতিক কার্যক্রম ও অগ্রগতি:

পরিবেশ ও প্রতিবেশ সংরক্ষণ, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, ভূমির ক্ষয় রোধ, দেশের মরুময়তা হ্রাস, কার্বন আধার সৃষ্টি, প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবেলা, গ্রাম বাংলার দরিদ্র মহিলাসহ সাধারণ মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুপ প্রভাব মোকাবেলায় অভিযোজন ও প্রশমন এবং সর্বোপরি টেকসই উন্নয়নে গাছের গুরুত্ব দিন দিন বেড়েই চলেছে। জলবায়ুর তারতম্যের কারণে এ দেশে গাছগাছালীতে সমৃদ্ধ বিভিন্ন ধরনের বনাঞ্চল রয়েছে।

যেমন- পাহাড়ী বন, প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন, শাল বন, জলাভূমির বন ও সৃজিত উপকূলীয় বন ।দেশের মোট আয়তনের ১৭.৬২ শতাংশ এলাকায় বনভূমি রয়েছে। তাছাড়া গ্রামীণ এলাকায় আছে বসত ভিটার বন। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০১৬-২০২০ মেয়াদে দেশের বৃক্ষাচ্ছাদিত ভূমির শতকরা হার ২০ ভাগে উন্নীত করার লক্ষ্যে বনায়ন ও বন সংরক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত আছে। সরকারী বনাঞ্চলে বনায়নের পাশাপাশি গ্রামীন এলাকা, উপকূলীয় অঞ্চলে জেগে উঠা চর ভূমি এবং সকল ধরনের প্রান্তিক ভূমি বনায়নের আওতায় আনা হচ্ছে। এ সকল কার্যক্রমকে অব্যাহত রাখার জন্য বন অধিদপ্তর বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। ২০১৮-১৯ আর্থিক সালে বন অধিদপ্তর-এর আওতায় বাস্তবায়িত এডিপিভূক্ত ২১ টি উন্নয়নপ্রকল্প এবং জলবায়ু পরির্বতন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে বাস্তবায়িত ২০টি উন্নায়ন প্রকল্প চলমান আছে। ২০১৮-১৯ আর্থিক সালের উন্নয়ন প্রকল্পের বরাদ্দ জিওবি ১৭১৭০.০০ লক্ষ টাকা এবং বৈদেশিক সহায়তা ১৫৮৮৮.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প তালিকা

বিনিয়োগ প্রকল্পঃ

১. লালমাই পাহাড় এলাকায় উদ্ভিদ উদ্যান স্থাপন (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৯)

২. বন বিভাগের সকল প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউটসমূহের সুবিধাদির উন্নয়ন (জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০১৯)

৩. বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের ইকো-রিস্টোরেশন (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২০)

৪. বাংলাদেশের পাঁচটি উপকূলীয় জেলায় বনায়ন (জুলাই, ২০১৫ হতে ডিসেম্বর, ২০২০)

৫. জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যান এবং বলধা বাগান, ঢাকা এর সংরক্ষণ ও অধিকতর উন্নয়ন (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৯)

৬. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, গাজীপুরের এ্যাপ্রোচ সড়ক প্রশস্তকরণ ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন (জানুয়ারী, ২০১৭ হতে ডিসেম্বর, ২০১৯)

৭. বৃহত্তর রংপুর জেলার সামাজিক বনায়নের টেকসই উন্নয়ন (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২০)

৮. বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও আবাসস্থল উন্নয়ন (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২০)

৯. শেখ রাসেল এ্যাভিয়ারী এ্যান্ড ইকো-পার্ক, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম (২য় পর্যায়) (জানুয়ারী, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২০)

১০. বঙ্গোপসাগরে জেগে ওঠা নতুন চরসহ উপকূলীয় এলাকায় বনায়ন (জানুয়ারী, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২০)

১১. প্রতিবেশ উন্নয়ন ও পাল্পউড উৎপাদনের লক্ষ্যে কাপ্তাই পাল্পউড বাগান বিভাগের অধিক্ষেত্রে দেশীয় প্রজাতির স্বল্প মেয়াদী বাগান সৃজন (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১)

১২. টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল) (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১)

কারিগরী প্রকল্পঃ

১. UN REDD Bangladesh National Programme (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৯)

২. Strengthening National Forest Inventory and Satellite Land Monitoring System in Support of REDD+ in Bangladesh (জানুয়ারী, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৯)

৩. ইন্টিগ্রেটিং কমিউনিটি বেইজড এ্যাডাপটেশন ইন টু এ্যাফোরেস্টেশন এন্ড রিফোরেস্টেশন প্রোগ্রাম ইন বাংলাদেশ (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২০)

৪. Expanding the Protected Area System to Incorporate Important Aquatic Ecosystem. (জুলাই, ২০১৬ হতে ডিসেম্বর, ২০১৯)

জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের প্রকল্পঃ

১. জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় ভান্ডারিয়া উপজেলাধীন চরখালী ফেরীঘাট সংলগ্ন চর এলাকা বনায়নের মাধ্যমে ভূমির উন্নয়ন ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা (এপ্রিল, ২০১৪ হতে ডিসেম্বর, ২০১৯)

২. জাতীয় সংরক্ষণ কৌশল (খসড়া) সংশোধন ও পরিমার্জন (জুলাই ২০১৫-জুন, ২০১৯ পর্যন্ত)

৩. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, গাজীপুর এর বর্ধিতাংশে বায়োডাইভারসিটি পার্ক উন্নয়ন (আগস্ট, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৯ পর্যন্ত)

৪. পিরোজপুর রিভারভিউ ইকোপার্ক (ডি, সি পার্ক) এর সংস্কার ও সৌন্দর্য্যবর্ধন কাজ ও বনায়ন (ডিসেম্বর, ২০১৫ হতে ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত)

৫. জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় উপকূলীয় অঞ্চলের পিরোজপুর জেলাধীন ভান্ডারিয়া উপজেলার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও সবুজ বেষ্টনী সৃজনের লক্ষ্যে মরাখালসমূহ পুনঃখনন এবং বনায়ন ও পরিবেশ উন্নয়ন (জুলাই, ২০১৬ হতে ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত)

৬. পিরোজপুর পুলিশ লাইন ইকো পার্ক নির্মাণ (জুলাই, ২০১৬ হতে ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত)

৭. ভাণ্ডারিয়া থানা ইকো-পার্ক উন্নয়ন ও সংস্কার (অক্টোবর, ২০১৬ হতে ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত)

৮. কুকরী-মুকরী ইকোপার্ক স্থাপন (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত)

৯. মানুষ-হাতি দ্বন্দ্ব নিরসনে সৌর বেষ্টনী স্থাপন (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত)

১০. শেখ রাসেল এভিয়ারী এন্ড ইকো পার্ক, রাংগুনিয়া, চট্টগ্রাম প্রকল্পের এর আওতায় বিদ্যমান স্থাপনার সংস্কার ও সংরক্ষণ ((আগস্ট, ২০১৭ হতে জুলাই, ২০১৯ পর্যন্ত)

১১. সিরাজগঞ্জ জেলাধীন কাজিপুর উপজেলায় শহীদ ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী ইকোপার্ক স্থাপনের মাধ্যমে জনসাধারণের বিনোদনের সুযোগ সৃষ্টি (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত)

১২. রাঙ্গামাটি অঞ্চলের অতিবর্ষন জনিত ভূমিধ্বসে ক্ষতিগ্রস্থ স্থাপনা সমূহ মেরামত ও সংস্কার (জানুয়ারী, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত)

১৩. জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় সারাদেশব্যাপী ব্যাপক বনায়নের লক্ষ্যে চারা উত্তোলন (৩য় পর্যায়) (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত)

১৪. চরফ্যাশন রেঞ্জের অবকাঠামো উন্নয়ন (ডিসেম্বর, ২০১৮ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত)

১৫. খুলনা জেলায় শেখ রাসেল ইকো পার্ক স্থাপন (জুন, ২০১৮ হতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত)

১৬. হাটহাজারী ইকোপার্ক ও বোটানিক্যাল গার্ডেন স্থাপন (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত)

১৭. সুন্দরবনে টেলি-যোগাযোগ ব্যবস্থার পুনঃস্থাপন (সেপ্টেম্বর, ২০১৮ হতে আগষ্ট ২০১৯ পর্যন্ত)

১৮. সিরাজগঞ্জ জেলাধীন কাজিপুর উপজেলায় সমন্বিত বনায়নের মাধ্যমে যমুনা নদীর চরাঞ্চল ও নাটুয়ার পাড়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ রক্ষা (নভেম্বও, ২০১৮ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত)

১৯. পিরোজপুর জেলার কাউখালী রিভারসাইড ইকোপার্কের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ (অক্টোবর, ২০১৮ হতে সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত)

ন্যাশনাল ফরেস্ট ইনভেন্টরী এবং সেটেলাইটের মাধ্যমে ভূমি পরিবীক্ষণ পদ্ধতি

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন USAID এর আর্থিক এবং জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষিসংস্থা (FAO)এর কারিগরি সহায়তায় বন অধিদপ্তর উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটি ২০১৫- ২০১৯ মেয়াদে "বৃক্ষ ও বন জরিপ" বাস্তবায়ন করছে। পূর্বে পরিচালিত বন জরিপের সকল নকশা এবং মূল বনখাতের অংশীজনদের সাথে পর্যালোচনা করে এ বারের বৃক্ষ ও বন এবং আর্থসামাজিক জরিপ পরিচালনা করার জন্য নকশা প্রণয়ন করা হয়েছে। দেশব্যাপী বৃক্ষ ও বন জরিপ পরিচালনা করার পাঁচটি জোন বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। সে গুলো হলো শাল, পাহাড়ী, সুন্দরবন, উপকূলীয় এবং গ্রামীন জোন। নিচের মানচিত্রে জোনের অবস্থান দেখানো হয়েছে। সকল জোনে বৃক্ষ ও বন জরিপের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

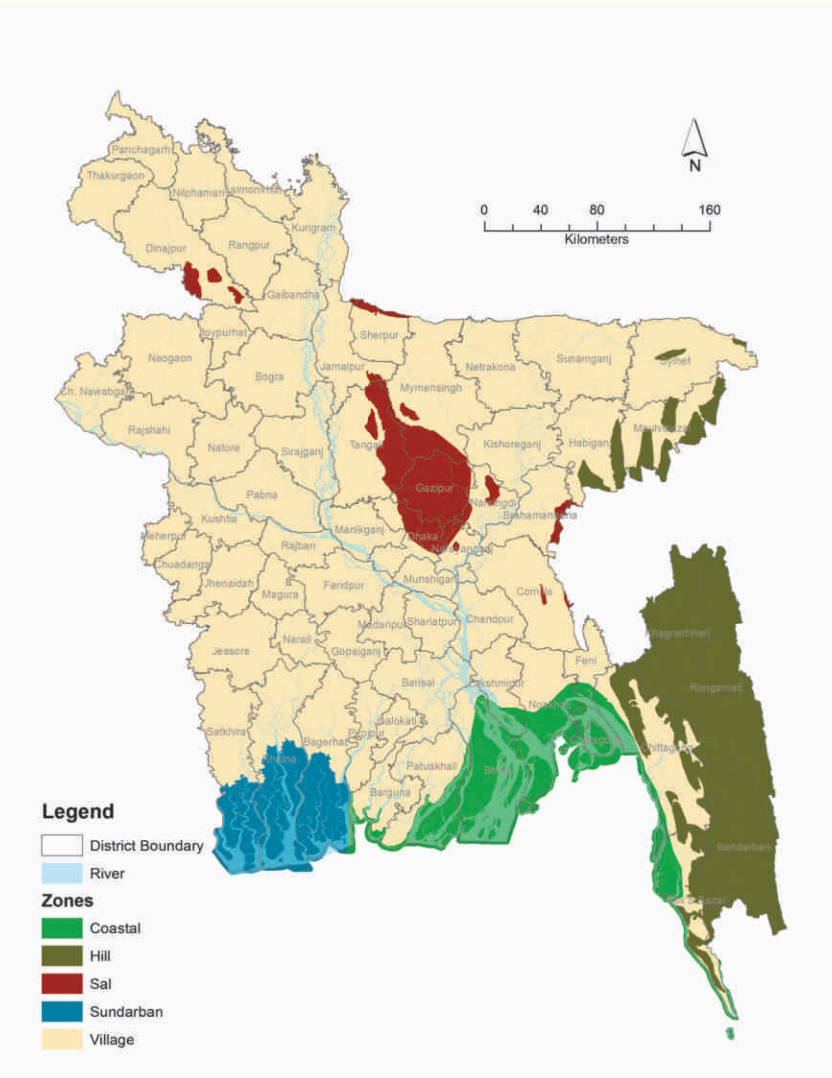

বাংলাদেশ বৃক্ষ ও বন জরিপ জোন মানচিত্র

নক্সা অনুযায়ী ১৮৫৮ টি প্লট থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করার কথা থাকলেও বিভিন্ন অসুবিধা যেমন ঃ খাড়া ঢাল, জলাশয়, সংরক্ষিত এলাকা, প্রাচীর, ভবন, সীমান্ত এলাকা ইত্যাদি কারণে সবগুলো প্লট থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী ১৪৮০ টি প্লট থেকে সম্পূর্ণ উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। ৩০১ টি প্লট থেকে আংশিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং ৪২টি প্লট থেকে কোন উপাত্ত সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই।

সার্বিকভাবে এ জরিপ দেশের সরকারী বন ও এর বাইরের এলাকার বন ও বৃক্ষের পরিমাণ, বনজ সম্পদ, বনের আচ্ছাদন, গাছের প্রজাতি, কাঠ ও জ্বালানি কাঠের পরিমাণ এবং বন হতে প্রাপ্ত সুবিধাদি নিরূপন করা যাবে। সংগ্রহকৃত তথ্য পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে রিপোর্ট প্রস্তুতের কাজ চলমান আছে। দেশের সরকারী বন ও এর বাইরের বৃক্ষ সম্পদের উন্নয়নে সরকারী, ব্যক্তি বা

প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে বৃক্ষ রোপনের উদ্যোগকে ভবিষ্যত পরিকল্পনায় সার্বিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য এবং জলবায়ূ পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন তার নির্দেশনা দিবে। সকল জোনে আর্থ সামাজিক জরিপ কার্য নভেম্বর ২০১৭ - মার্চ ২০১৮ মেয়াদে পরিচালনা করা হয়েছে। এ জরিপের ৫টি জোনের মাধ্যমে ৬৪০০টি পরিবার থেকে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। উক্ত জরিপ সমূহ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS) বন অধিদপ্তরকে সহায়তা প্রদান করেছে।এই প্রকল্পের আওতায় SPOT স্যাটেলাইট ইমেজ ব্যবহার করে বাংলাদেশের ভূমি ব্যবহার মানচিত্র, ২০১৫ প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে, যা বন অধিদপ্তরের তথ্য ব্যবস্থাপনার কাজে সমন্বিত পদ্ধতি উন্নয়নে সহায়ক হবে।

সুফল প্রকল্প

বন অধিদপ্তর বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় "সুফল প্রকল্প (Sustainable Forest and Livelihood, SUFAL Project)" জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০১৮ মেয়াদে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা এবং বন নির্ভর মানুষের বিকল্প আয়ের সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে বনের উন্নয়ন করা প্রকল্পের উদ্দেশ্য। বন সংরক্ষণে সরকারী খাতের বন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং বন সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধারে জনগনের অংশগ্রহন বৃদ্ধি এবং বন নির্ভর মানুষের বিকল্প আয়ের সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে বনের উপর নির্ভরতা কমিয়ে বন ও বৃক্ষ সম্পদ সংরক্ষণের মাধ্যমে প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন করা সম্ভব হবে।

প্রকল্প বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখযোগ্য কম্পোনেন্ট সমূহঃ

কম্পোনেন্ট ১ - প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন, তথ্য পদ্ধতি ও প্রশিক্ষণ।

কম্পোনেন্ট ২ - বন ও রক্ষিত এলাকায় সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ।

কম্পোনেন্ট ৩ - বন নির্ভর মানুষের জন্য বিকল্প আয়ের সুযোগ বৃদ্ধি।

কম্পোনেন্ট ৪ - প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, পর্যবেক্ষণ ও প্রতিবেদন প্রস্তুত।

প্রকল্পের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য লক্ষ্যমাত্রাঃ

- তথ্য পদ্ধতি ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বন অধিদপ্তরের উন্নয়ন।
- পাহাড়ী ও শাল বনে এসিস্টেড ন্যাচারাল রিজেনারেশন/ এনরিচমেন্ট, বন্যপ্রাণীর খাদ্য এবং Non-Timber Forest Product বাগান উন্নয়নের মাধ্যমে ৫২,৭২০ হেক্টর অবক্ষয়িত বন ও বন শূন্য এলাকা এবং বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল পুনরুদ্ধার।
- উপকূলীয় অঞ্চলে ২৪,৮৮০হে নতুন জেগে উঠা চর বনায়নের মাধ্যমে সবুজ বেষ্টনী তৈরী করে জনগনকে ঝড়ঝঞ্জা থেকে সুরক্ষা প্রদান।
- বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও আবাসস্থল উন্নয়নকল্পে ২০টি রক্ষিত এলাকায় পশুখাদ্য হিসেবে ২৫০০ হেঃ ফলজ বৃক্ষ বনায়ন।
- প্রকল্প এলাকায় অবস্থিত বন ও ৫টি রক্ষিত এলাকায় বসবাসরত ৬০০ গ্রাম থেকে ৪০,০০০ জন বন নির্ভর জনগনকে সম্পৃক্ত করে ২০০০ মিলিয়ন ডলার ব্যয়ে কমিউনিটি উন্নয়ন তহবিল গঠন এবং তাদের বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা করা।
- ৬০০ সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন ও বিভিন্ন কাজে তদারকির জন্য উপকমিটি গঠন।
- বিভিন্ন কর্মকান্ডের তথ্য উপাত্ত নিয়ে অনলাইন ডাটাবেস প্রস্তুত।
- দূর অনুধাবণ পদ্ধতি ব্যবহার করে বনায়ন পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি স্থাপনসহ অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন।

সুন্দরবনের বাঘ শুমারী

USAID এর আর্থিক সহায়তায় Bengal Tiger Conservation Activity (BAGH) প্রকল্পের আওতায় দ্বিতীয় পর্যায়ে সুন্দরবনে ক্যামেরা ট্র্যাপিং এর মাধ্যমে বাঘ গণনার কার্যক্রম শুরু করা হয়। ১লা ডিসেম্বর, ২০১৬ সাল থেকে শুরু করে ২৪ শে এপ্রিল, ২০১৮ সাল পর্যন্ত চারটি ধাপে সুন্দরবনের সাতক্ষীরা, খুলনা ও শরণখোলা রেঞ্জের তিনটি ব্লকের ১,৬৫৬ বর্গ কিঃ মিঃ এলাকায় বিশেষ এক ধরনের ক্যামেরা ব্যবহার করে জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। ২২ মে ২০১৯ তারিখে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রলালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ শাহাব উদ্দিন, এমপি এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উক্ত জরিপের ফলাফল প্রকাশ করেন। মোট ২৪৯ দিনব্যাপী পরিচালিত এ জরিপ কার্যক্রমে ৬৩টি পূর্ণবয়স্ক বাঘ, ৪টি জুভেনাইল বাঘ এবং ৫টি অপ্রাপ্ত বয়স্ক বাঘের সর্বমোট ২৪৬৬টি ছবি পাওয়া যায়। SERC মডেলে তথ্য বিশ্লেষণ করে সুন্দরবনের প্রতি ১০০ বর্গ কিঃ মিঃ এলাকায় বাঘের আপেক্ষিক ঘনত্ব পাওয়া যায় ২.৫৫+০.৩২। সুন্দরবনে বাঘের বিচরণ ক্ষেত্র ৪,৪৬৪ কিঃ মিঃ এলাকাকে আপেক্ষিক ঘনত্ব দিয়ে গুণণ করে বাঘের সংখ্যা হিসাব করা হয়েছে ১১৪টি। এ হিসাব অনুযায়ী ২০১৮ সালের জরিপে সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা শতকরা ৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্লক অনুযায়ী বাঘের ঘনত্ব বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, শরণখোলা রেঞ্জে বাঘের ঘনত্ব সবচেয়ে বেশী (৩.৩৩ বাঘ/১০০ বর্গ কিঃ মিঃ) এবং খুলনা রেঞ্জে বাঘের ঘনত্ব সবচেয়ে কম (১.২১ বাঘ/১০০ বর্গ কিঃ মিঃ)।

২০১৫ সালে সুন্দরবনে ক্যামেরা ট্র্যাপিং এর মাধ্যমে প্রথমবারের মত বাঘ গণনার কার্যক্রম শুরু করা হয়েছিল। সে হিসাব অনুযায়ী বাঘের ঘনত্ব ছিল প্রতি ১০০ বর্গ কিঃ মিঃ এ ২.১৭টি এবং মোট বাঘের সংখ্যা ছিল ১০৬টি।

ক্যামেরা ট্র্যাপিং এর মাধ্যমে প্রাপ্ত বাঘের ছবি।

বাংলাদেশ বন মহা পরিকল্পনা (২০১৭-২০৩৭)

১৯৯৫ সনে বাংলাদেশ বন বিভাগ প্রথমবারের মতো ২০ বৎসরের জন্যে একটি বন মহাপকিল্পনা প্রণয়ন করে যার একটি উদ্দেশ্য ছিল দেশের ২০ শতাংশ ভূমি বন আচ্ছাদনের ভেতরে নিয়ে আসা। উক্ত মহা পরিকল্পনা বন ও বাস্তুতন্ত্রের অন্যান্য বিষয় যেমন Sustainable Forest Management, জীববৈচিত্র্য, জলবায়ু পরিবর্তন, ইকোসিস্টেম সার্ভিসের ঝুকি, আন্তর্জাতিক

কনভেনশনের প্রতিশ্রুতি, বন পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা এবং দূর অনুধাবন (Remote Sensing) এবং ভৌগোলিক তথ্য পদ্ধতি (GIS) ইত্যাদির উপর যথাযথভাবে গুরুত্ব দিতে সমর্থ হয়নি, ২০ বৎসরের পুরাতন উক্ত মহাপরিকল্পনাকে ২০১৩ সালে হালনাগাদ করে পরবর্তি ২০ বৎসরের জন্য অর্থাৎ ২০১৭-২০৩৭ সাল পর্যন্ত করা হয়েছে। হালনাগাদ বন মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন দেশীয় এবং আর্ন্তজাতিক বিশ্লেষক ও সংস্থার সহায়তায় হালনাগাদ করা হয়েছে যা সহসা অনুমোদনের জন্য সরকারের নিকট দাখিল করা হবে।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন করার নিমিত্তে বন অধিদপ্তরে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের জন্য কর্ম পরিকল্পনা ও অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো তৈরী করা হয়েছে এবং তার যথাযথ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের জন্য প্রধান বন সংরক্ষকের দপ্তর , বন সংরক্ষকগণের দপ্তর এবং বিভাগীয় বন কর্মকর্তাগণের দপ্তরে নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয়েছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের জন্য প্রণীত কর্ম পরিকল্পনা অনুসারে নিয়মিতভাবে নৈতিকতা কমিটির মিটিং, প্রশিক্ষণ কর্মশালা, অংশীজন সভা ও সচেতনতামূলক সভার কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হচ্ছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার নীতিমালা ২০১৭ অনুযায়ী বাছাই কমিটি গঠন করা হয়েছে। বর্নিত নীতিমালার আলোকে কর্মচারীদের ভাল কাজে প্রণোদনা তৈরীর জন্য শুদ্ধাচার পুরষ্কার প্রদান করা হচ্ছে। জনগণকে প্রদেয় সেবা সহজীকরণ এবং জনবান্ধব করার জন্য বিভাগীয় কার্যালয়সমূহে ফ্রন্ট ডেস্ক গঠন করা হয়েছে। এছাড়া ইনোভেশন এর দ্বারা বিভিন্ন সেবাকে সহজীকরণ করা হচ্ছে। বিশেষ করে সামাজিক বনায়নে অংশগ্রহনকারী উপকারভোগীদেরকে অনলাইন চেক প্রদান করা হচ্ছে।

বন অধিদপ্তরের দাপ্তরিক কর্মচারীদের জন্য জাতীয় শুদ্ধাচার বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

বন অধিদপ্তরের উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি ও নাগরিক সেবা:

বন অধিদপ্তরের কাজের গতিশীলতা ও উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নাগরিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজীকরণের পন্থা উদ্ভাবন ও চর্চার লক্ষ্যে উদ্ভাবন পরিকল্পনা-২০১৮ - ২০১৯ এর আওতায় বন অধিদপ্তরের সেবা সহজীকরণ অথবা সেবায় ইনোভেশন বিষয়ে ৩(তিন) টি সেবা (১) অনলাইনে সামাজিক বনায়নে সম্পৃক্ত উপকারভোগীদের লভ্যাংশ বিতরণ (২) বন অধিদপ্তরের ইকোট্যুরিজম সাইট ও নার্সারীর তথ্যাদি সম্বন্ধে এ্যাপস তৈরী এবং (৩) বন্যপ্রাণী সার্কেলে মাঠ পর্যায়ের কর্মচারীদের অবস্থান নির্ণয়ের জন্য মোবাইল ট্রাকিং সিস্টেম চালুকরণের মাধ্যমে সহজীকরণ করা হচ্ছে।

অন লাইন সেবার আরও একটি কার্যক্রম 'জিও পোর্টাল' এর মাধ্যমে জনগণের কাছে বৃক্ষ সম্পর্কিত তথ্যাদি সহজভাবে পৌছানোর নিমিত্ত টাঙ্গাইল বন বিভাগের অন্তর্ভূক্ত বাঁশতৈল রেঞ্জকে পাইলট প্লান হিসাবে নির্বাচিত করা হয়েছে। পরীক্ষামূলকভাবে নূতন পদ্ধতিতে সেবা প্রদান শুরুর ফলে সেবা গ্রহীতার পক্ষে নিজ গৃহ থেকে ওয়েব সাইট ব্যবহার করে তাৎক্ষণিকভাবে তথ্যাদি জানা সম্ভব হবে।

ই-নথি (অফিস ব্যবস্থাপনা):

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক পরিচালিত এটুআই প্রোগ্রামের আওতায় বন অধিদপ্তরের সদর দপ্তর ২০১৭ সাল থেকে ই-নথি (অফিস ব্যবস্থাপনা) কার্যক্রমের সাথে যুক্ত হয়ে ই-নথি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। বন অধিদপ্তরের আঞ্চলিক ও মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহ এখনও ই-নথি সিস্টেমে যুক্ত করা হয়নি। শুধুমাত্র সদর দপ্তরের কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে বন অধিদপ্তর বাংলাদেশের মধ্যম ক্যাটাগরির ১৮টি দপ্তরের মধ্যে ১১ তম অবস্থানে উঠে এসেছে। চলতি অর্থ বছরে সদর দপ্তরের ৩৪ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ই-নথি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। অদুর ভবিষ্যতে এর কার্যক্রম আরও বৃদ্ধি পাবে।

বন অধিদপ্তরের আঞ্চলিক ও মাঠ পর্যায়ের দপ্তর সমূহকে ই-নথি সিস্টেমের আওতাভূক্ত করার কার্যক্রম চলছে। বন অধিদপ্তরের আঞ্চলিক ও মাঠ পর্যায়ের দপ্তর সমূহকে ই-নথি সিস্টেমের আওতায় আনা হলে বন অধিদপ্তর অপেক্ষাকৃত বড় ক্যাটাগরির অধিদপ্তরের মধ্যে একটা বিশেষ অবস্থানে পৌছানো সম্ভব হবে।

বন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কারঃ

জাতীয় পুরস্কারঃ

বৃক্ষরোপণে বিশেষ অবদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক "বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার" এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে বিশেষ অবদানের জন্য "বঙ্গবন্ধু এওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ড লাইফ কনজারভেশন" পুরস্কার প্রদান করা হয়ে থাকে।

আন্তর্জাতিক পুরস্কারঃ

বন সংরক্ষণ ও সহব্যবস্থাপনায় সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ বন বিভাগ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন করেছে । যথাঃ

i) UN declared Equitor Award 2012
ii) Wangiri Mathai Award 2012
iii) JSW Earth Care Award 2012
iv) Solution Search 2013
v) HSBC-Daily Star Climate Award
vi) People's Choice Award (The Conservance & RARE, USA)
vii) Champion of the earth 2015

বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কারঃ

সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বৃক্ষরোপণ আন্দোলনকে একটি স্থায়ী, চলমান স্বতঃস্ফূর্ত কার্যক্রমে পরিণত করার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুপ্রাণিত ও সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে বৃক্ষরোপণে যারা বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন তাদেরকে "বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার" প্রদান করা হয়। ১৯৯৩ সাল থেকে প্রতিবছর এই পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে। বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত বৃক্ষরোপণ কর্মকান্ডকে মোট ১০টি শ্রেণিভুক্ত করে প্রত্যেক শ্রেণিতে ১ম, ২য় ও ৩য় পুরস্কার প্রদান করা হয়। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও ২০ জুন, ২০১৯ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলার শুভ উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে "বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার" বিজয়ীদের মধ্যে বিতরণ করবেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক জাতীয় বৃক্ষমেলা ২০১৮ উদ্বোধন

প্রতিটি শ্রেণির পুরস্কার প্রাপ্তদের সনদসহ একাউন্ট পেয়ী চেকে অর্থ প্রদান করা হয়। প্রথম স্থান অধিকারীকে ৩০,০০০ টাকা, দ্বিতীয় স্থান অধিকারীকে ২০,০০০ টাকা এবং তৃতীয় স্থান অধিকারীকে ১৫,০০০ টাকা প্রদান করা হয়।

সামাজিক বনায়নের উপকারভোগীদের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর চেক বিতরণ

বঙ্গবন্ধু এওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন:

বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তি ও প্রোটোকলে স্বাক্ষরদাতা দেশ। প্রকৃতি ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণবাদী সংস্থা ও ব্যক্তিকে জাতীয়ভাবে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে "বঙ্গবন্ধু এওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন" প্রবর্তন করা হয়েছে। এবছর মোট ৩টি পুরস্কার প্রদান করা হবে। প্রত্যেক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে একটি ২ ভরি (২৩.৩২ গ্রাম) ওজনের স্বর্ণপদক, সনদপত্র ও ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা প্রদান করা হবে। পুরস্কারের অর্থ একাউন্ট পেয়ী চেকের মাধ্যমে প্রদান করা হবে।

২০১০ সাল হতে বন্যপ্রাণী বিষয়ক শিক্ষা, গবেষণা ও সংরক্ষণ কাজে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান, বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা, খ্যাতিমান গবেষক, বিজ্ঞানী, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণবাদী ব্যক্তি ও সাংবাদিক, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রচার ও প্রকাশনা এবং নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তিদেরকে সরকার এই মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কারে ভূষিত করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে পুরস্কার নিচ্ছেন জনাব ইনাম আল হক, পাখি বিশেষজ্ঞ এবং প্রতিষ্ঠাতা,বাংলাদেশ বার্ড ক্লাব, ঢাকা।

২০১০ সালে ০৩ জন, ২০১১ সালে ০২ জন, ২০১২ সালে ০৩ জন, ২০১৩ সালে ০৩ জন,২০১৪ সালে ০৪ জন, ২০১৫ সালে ০৪ জন ,২০১৬ সালে ০২ জন ব্যক্তি ও ১টি প্রতিষ্ঠান, ২০১৭ সালে ০২ জন ব্যক্তি ও ১টি প্রতিষ্ঠান এবং ২০১৮ সালে ০২ জন ব্যক্তি ও ১টি প্রতিষ্ঠান এই পুরস্কার লাভ করেন।

২০১৮ সালে পুরস্কার প্রাপ্তদের তালিকা

ক্রমিক নং	ক্যাটাগরী	পুরস্কার প্রাপ্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান
১।	বন্যপ্রাণী ও সংরক্ষণ কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা খ্যাতিমান গবেষক, বিজ্ঞানী, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণবাদী ব্যক্তি ও সাংবাদিক	ইমান আল হক, পাখি বিশেষজ্ঞ এবং প্রতিষ্ঠাতা বাংলাদেশ বার্ড ক্লাব, ঢাকা।
২।	বন্যপ্রাণী বিষয়ক শিক্ষা ও গবেষণা	ড. মোঃ মফিজুল কবির, অধ্যাপক, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, জাহাঙ্গিরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।
৩।	বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে নিবেদিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান	নির্মল বর্মন প্রতিষ্ঠাতা, আলি দেওনা পাখি সংরক্ষণ কমিটি মহাদেবপুর, নওগাঁ।

সংরক্ষিত বনভূমিতে বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিক কর্তৃক বসতি স্থাপন, বনজ সম্পদ ও পরিবেশ ধ্বংসের তথ্যঃ

মায়ানমার এর রাখাইন প্রদেশে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার জন্য সেখানকার নির্যাতিত মুসলিম জনগোষ্ঠি বিভিন্ন সময়ে সীমান্ত পার হয়ে বাংলাদেশে আগমন করে। পরবর্তীতে তাদেরকে কক্সবাজার জেলার উখিয়া উপজেলার কুতুপালং ও টেকনাফ উপজেলার নয়াপাড়া রেজিস্টার্ড শরণার্থী ক্যাম্পে পুনর্বাসন করা হয়। এর বাইরে উখিয়া উপজেলার কুতুপালং ও টেকনাফের লেদা আনরেজিস্টার্ড শরণার্থী ক্যাম্পেও রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠি বসতি স্থাপন করে। উক্ত ক্যাম্পগুলি কক্সবাজার দক্ষিণ বন বিভাগের গেজেটভূক্ত সংরক্ষিত/রক্ষিত বনভূমিতে অবস্থিত। পরবর্তীতে ২০১৬ সালের শেষের দিকে পুনরায় তারা ব্যাপকহারে সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। উক্ত জনগোষ্ঠি বনভূমিতে বসতি স্থাপন করার ফলে একদিকে যেমন বনভূমি জবরদখল হয়ে যায় অন্যদিকে তাদের জীবিকার বিকল্প কোন ব্যবস্থা না থাকায় বনভূমির গাছ কর্তন ও পাচারে লিপ্ত হয়। শরণার্থী ক্যাম্প ও বনাঞ্চলে বসবাসকারী রোহিঙ্গারা বিভিন্ন ধরনের অপরাধ কর্মকান্ড ছাড়াও বন ও পরিবেশের ব্যপক ক্ষতি সাধন করে আসছে। তন্মধ্যে অন্যতম ক্ষতিকর দিকগুলো হলো- বিপুল পরিমাণ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির জ্বালানীর চাহিদা মেটাতে বনভূমি হতে ব্যাপকভাবে জ্বালানী সংগ্রহ, পাহাড় কর্তন ও মাটি বিক্রি, অবৈধভাবে কাঠ ও অন্যান্য বনজদ্রব্য পাচার, বনভূমি

জবরদখলসহ অন্যান্য অপরাধমূলক কর্মকান্ডে স্থানীয় প্রভাবশালী/কুচক্রিমহল কর্তৃক রোহিঙ্গাদের ব্যবহার, স্থানীয় প্রভাবশালী গোষ্টি কর্তৃক অবৈধভাবে গাছ কর্তন ও পাচার কাজে শ্রমিক হিসেবে রোহিঙ্গাদের ব্যবহার, রোহিঙ্গাদের সংখ্যা অত্যধিক হওয়ায় (বিশেষ করে অনিবন্ধিত) গণস্বাস্থ্য, পয়:নিষ্কাশন, সামাজিক কর্মকান্ড, গণযোগাযোগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে, এতদ্ব্যতীত সঠিক নাম ঠিকানার অভাবে রোহিঙ্গাদের (বিশেষ করে অনিবন্ধিত) দ্বারা অপরাধমূলক কর্মকান্ড সংগঠিত হওয়ার পরও অপরাধীকে যথাযথভাবে সনাক্ত এবং আইনানূগ ব্যবস্থা গ্রহণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুরূহ হয়ে পড়ে।

মায়ানমারের রাখাইন প্রদেশে পুনরায় সহিংসতার কারণে গত ২৫ আগস্ট, ২০১৮ তারিখ হতে ব্যাপকহারে রোহিঙ্গা জনগোষ্টি সীমান্ত অতিক্রম করে এবং প্রায় ১১ লক্ষাধিক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করে বনভূমিতে বসতি স্থাপন শুরু করে। একই সাথে লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠি অনুপ্রবেশ করে বনভূমিতে বসতি স্থাপনকালে সীমিত জনবল নিয়ে উহা প্রতিহত করা সম্ভব হয়নি। উখিয়া উপজেলার কুতুপালং, বালুখালী, বালুখালী ঢালা/ময়নারঘোনা, তাজনিমা খোলা, মক্করার বিল/হাকিমপাড়া, জামতলী বাঘঘোনা, শফিউল্লা কাটা এবং টেকনাফ উপজেলার পুটিবুনিয়া ও কেরনতলী এলাকায় বন বিভাগের গেজেটভূক্ত বনভূমিতে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠি অস্থায়ী বসতি স্থাপন করে এবং বন ও বনজসম্পদের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। ১১ লক্ষাধিক রোহিঙ্গা কক্সবাজার দক্ষিণ বন বিভাগের ৬১৬৪.০২ একর বনভূমিতে বসতি স্থাপনের ফলে ২০২৭.৫০ একর বনভূমির সৃজিত বন (প্রধানতঃ সামাজিক বনায়ন) এবং ৪১৩৬.৫২ একর প্রাকৃতিক বন ধ্বংস হয়ে যায়। সৃজিত বনের ক্ষেত্রে বনজসম্পদের ক্ষতির পরিমাণ ১৯৭,৯৬,৯১,৯৭৫.৭৮ টাকা। ৪,১৩৬.৫২ একর প্রাকৃতিক বন মূলতঃ প্রাকৃতিকভাবে জন্মানো বিবিধ প্রজাতির গাছ , লতা, গুল্ম, সানগ্রাস, উলুফুল, বাঁশ, বেত, ঔষধি গাছসহ অন্যান্য আগাছা জাতীয় উদ্ভিদ ছিল। প্রাকৃতিক বনের আনুমানিক ক্ষতি ২৫৮,১১,১১,৬৬৪.৮২। মোট ক্ষতির পরিমাণ ৪৫৬,০৮,০৩,৬৪০.৬০ টাকা।

এছাড়া, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠি কক্সবাজার দক্ষিণ বন বিভাগের সংরক্ষিত/রক্ষিত বনভূমিতে ব্যাপকভাবে বসতি স্থাপন করার ফলে জীববৈচিত্র্য ব্যাপকভাবে ধ্বংস হয়। জীববৈচিত্র্যের ক্ষয়ক্ষতি নিরূপনে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন এবং বিশেষজ্ঞ কমিটির মাধ্যমে উহা নিরূপন করা বাঞ্ছনীয়। কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলায় বাস্তবায়নাধীন Single Point Mooring (SPM) প্রকল্পের জন্য প্রস্তাবিত সংরক্ষিত বনভূমির জন্য গত সেপ্টেম্বর/২০১৬ খ্রিঃ মসে বিশেষজ্ঞ কমিটি দ্বারা জীববৈচিত্র্যের ক্ষয়ক্ষতি নিরূপন করা হয়েছিল। একই জেলায় প্রায় একই ভূ-প্রকৃতির অংশ হওয়ায় Single Point Mooring (SPM) প্রকল্পের জন্য বিশেষজ্ঞ কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত ক্ষয়ক্ষতির অনুরূপ হারে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠি দ্বারা ধ্বংস প্রাপ্ত ৬,১৬৪.০২ একর রক্ষিত ও সংরক্ষিত বনভূমির জীববৈচিত্র্যের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দাড়ায় ১৪,০৯,৪৮,৫৪,১৯৫.১৯ টাকা (কম/বেশি)। অর্থাৎ বনজদ্রব্য ও জীববৈচিত্র্যের মোট ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় ১৮৬৫,৫৬,৫৭,৮৩৫/৭৯ (বনজদ্রব্য ৪৫৬,০৮,০৩,৬৪০/৬০ + জীববৈচিত্র্য ১৪,০৯,৪৮,৫৪,১৯৫/১৯ টাকা)।

চিত্রঃ বন ভূমি ধ্বংস করে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী কর্তৃক বসতি স্থাপন

বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক ক্যাম্প এলাকায় চলাচলের জন্য রাস্তা, শৌচাগার, নলকূপ, গুদামঘর/ওয়ারহাউজ ইত্যাদি তৈরী করা হচ্ছে। বন বিভাগের গেজেটভূক্ত সংরক্ষিত/রক্ষিত বনভূমিতে স্থাপনা তৈরী করা হলেও উক্ত বিষয়ে বন বিভাগকে অবহিত করা হচ্ছে না। শরণার্থী, ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার, কক্সবাজার কর্তৃক মায়ানমার হতে আগত আশ্রয়প্রার্থীদের মানবিক সহায়তা প্রদান কাজের হালনাগাদ অবস্থা ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য তথ্যাবলী বিষয়ে ২১ মে, ২০১৯ খ্রিঃ তারিখে প্রদত্ত প্রতিবেদনে দেখা যায়, রোহিঙ্গা ক্যাম্প এলাকায় এ পর্যন্ত ২,১২,৬০৭ টি ঘর, ৮০৬৩টি নলকূল, ৫৭৮৫১ টি ল্যাট্রিন, ১৫৯৮২টি গোসলখানা, ১৩ কিঃ মিঃ বিদ্যুৎ লাইন, ৩০ কিঃ মিঃ সড়ক , ত্রাণ সংরক্ষণের জন্য ২০ টি অস্থায়ী গুদাম, ২০ কিঃ মিঃ খাল খনন করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, স্থাপনার পরিমাণ প্রতিনিয়ত বাড়ছে। স্থাপনাসমূহ নির্মাণের জন্য IOM, UNHCR সহ বিভিন্ন এনজিও, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, এলজিইডি, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরসহ অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক ব্যাপকহারে পাহাড় কর্তন করা হচ্ছে। এছাড়া, ক্যাম্প এলাকার বনভূমির পাহাড় কর্তন করে ক্যাম্প ইনচার্জ , পুলিশ ক্যাম্প এবং বিভিন্ন সংস্থার অফিসের জন্য স্থায়ী অবকাঠামো তৈরী করা হচ্ছে।

চিত্রঃ রিজার্ভ উখিয়ারঘাট মৌজার মধুরছড়া এলাকার সংরক্ষিত বনভূমিতে নির্মিত পুলিশ ক্যাম্প

চিত্র: বাগান ধ্বংস করে তৈরী করা WFP এর সাইলো

কক্সবাজার জেলার বনভূমি Critically Endangered এশিয়ান হাতির বাসস্থান, বিচরণ ও প্রজননক্ষেত্র। IUCN (International Union for Conservation of Nature) এর ২০১৭ সালের প্রতিবেদন মোতাবেক এ বন বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকায় ৬৩টি এশিয়ান হাতি বাস করে। রোহিঙ্গা ক্যাম্প স্থাপনের ফলে Elephant-Human Conflict বৃদ্ধি পেয়েছে। ইতোমধ্যে হাতির আক্রমনে অন্ততঃ ১২ জন রোহিঙ্গা নিহত হয়েছে। উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলার বনভূমিতে পরিকল্পনাহীন বসতি স্থাপন এবং জ্বালানী কাঠ সংগ্রহের জন্য নির্বিচারে গাছ ও পাহাড় কর্তণ করে আবাসস্থল ধ্বংস করায় অদুর ভবিষ্যতে হাতি খাদ্যসংকটে পতিত হবে এবং হাতির প্রজননও ব্যাহত হবে। ফলে ভবিষ্যতে হাতি - মানুষ সংঘাত এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে পারে।

চিত্রঃ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠি কর্তৃক পার্শ্ববর্তী বনাঞ্চল হতে জ্বালানী সংগ্রহ

কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় বন বিভাগের পাহাড়ে পরিকল্পনাহীন রোহিঙ্গা বসতি তৈরী এবং রাস্তাসহ অন্যান্য স্থাপনা তৈরীর জন্য নির্বিচারে পাহাড় কর্তন এবং বৃক্ষাচ্ছাদন ধ্বংসের ফলে মাটি উন্মুক্ত হয়ে যাওয়ায় ভবিষ্যতে বর্ষায় রোহিঙ্গা বসতি এলাকায় পাহাড় ধ্বসের আশংকা তৈরী হয়েছে। ক্যাম্প এলাকাতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিক্ষিপ্তভাবে ঘাস ও গাছের চারা রোপণ করা হলেও সেটি খুব পরিকল্পিত নয়। এক্ষেত্রে সমন্বিত উদ্যোগ একান্ত প্রয়োজন।

চিত্র: পাহাড় কেটে রাস্তা তৈরী

আন্তর্জাতিক দিবস সমূহ:

জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিকভাবে ঘোষিত দিবস উপলক্ষে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশে ও বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করা হয়। দিবসগুলোর উপলক্ষে বন অধিদপ্তর বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করে। দিবসগুলির তাৎপর্য ও অবদান সম্পর্কে গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বন বিভাগ বিভিন্ন সমাবেশ, শোভাযাত্রা ও আলোচনা সভার আয়োজন করে। নিম্নে বন বিভাগে উদযাপিত বিভিন্ন দিবসের ছবি ও তথ্য দেয়া হল:

বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস

আন্তর্জাতিক বন দিবস

২০১২ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ২১শে মার্চকে আন্তর্জাতিক বন দিবস হিসাবে উদযাপন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তারই ধারাবাহিকতায় ২০১৯ সালেও বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক বন দিবস পালন করা হয়। ২০১৯ সালে আন্তর্জাতিক বন দিবসের প্রতিপাদ্য হচ্ছে "বন বনানী জানি, জানাই - ভালবেসে বনকে বাঁচাই"। প্রতিবারের মতো বাংলাদেশ বন বিভাগ দিবসটিকে আড়ম্বরভাবে উদযাপন করে। বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর আন্তর্জাতিক বন দিবস-২০১৯ উদযাপন উপলক্ষে সকালে র‍্যালী এবং বন ভবন, আগারগাঁওস্থ হৈমন্তী সম্মেলন কক্ষে একটি সভার আয়োজন করে। উক্ত সভায় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব আব্দুল্লাহ আল মোহসীন হোসেন চৌধুরী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সম্মানিত অতিরিক্ত সচিব ড. মোঃ বিল্লাল হোসেনে এবং ইনস্টিটিউশন অব ফরেস্টারস, বাংলাদেশ এর সভাপতি জনাব মোঃ ইশতিয়াক উদ্দিন আহমেদ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি সভাপতিত্ব করেন জনাব মোহম্মাদ সফিউল আলম চৌধুরী, প্রধান বন সংরক্ষক, বাংলাদেশ। উক্ত সভায় মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর আলোচনা করেন ড. নিয়াজ আহমেদ খাঁন, অধ্যাপক, উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জনাব রুহুল মোহাইমেন চৌধুরী, কনসালটেন্ট, সুফল প্রকল্প । মাঠ পর্যায় থেকে আগত সহ-বন ব্যবস্থাপনা কমিটির (CMC) প্রতিনিধিবৃন্দ এবং বন অধিদপ্তরের ঢাকাস্থ সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

আন্তর্জাতিক বন দিবস উদ্‌যাপন

আর্ন্তজাতিক দিবস ঃ

১. বিশ্ব জলাভুমি দিবস: ২ ফেব্রুয়ারি।
২. আন্তর্জাতিক বন দিবস: ২১ মার্চ।
৩. বিশ্ব পানি দিবস: ২২ মার্চ।
৪. বিশ্ব ঐতিহ্য দিবস: ১৮ এপ্রিল।
৫. ধরিত্রী দিবস: ২২ এপ্রিল।
৬. আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র্য দিবস: ২২ মে।
৭. বিশ্ব পরিবেশ দিবস: ৫ জুন।
৮. বিশ্ব সমুদ্র দিবস: ৮ জুন।
৯. বিশ্ব বাঘ দিবস: ২৯ জুলাই।
১০. বিশ্ব হাতি দিবস: ১২ আগস্ট।
১১. আন্তর্জাতিক শকুন সচেতনতা দিবস: ৬ সেপ্টেম্বর।
১২. আন্তর্জাতিক ওজোন দিবস: ১৬ সেপ্টেম্বর।
১৩. বিশ্ব নদী দিবস: ২৮ সেপ্টেম্বর।
১৪. বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ দিবস: ৪ ডিসেম্বর।

আন্তঃসীমান্ত হাতি সংরক্ষণে বাংলাদেশ-ভারত দ্বিপাক্ষিক সভা

২৯ নভেম্বর, ২০১৮ বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগে আন্তঃসীমান্ত হাতি সংরক্ষণ বিষয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের বিশেষজ্ঞ ও উচ্চ পর্যায়ের সরকারী কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে তৃতীয়বারের মতো দিনব্যাপী এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ইতিপূর্বে ভারত সরকার এ ধরনের আরো দুটি দ্বিপাক্ষিক সভা আয়োজন করে। দ্বিপাক্ষিক সভার উদ্বোধনী পর্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব আবদুল্লাহ আল মোহসীন চৌধুরী, সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়। এ বছরের আলোচনা সভায় বাংলাদেশের পক্ষে নেতৃত্ব দিয়েছেন জনাব মোহাম্মদ সফিউল আলম চৌধুরী, প্রধান বন সংরক্ষক, বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর এবং ভারতের পক্ষে নেতৃত্ব দিয়েছেন শ্রী এম.এস. নেগী, এডিশনাল ডিরেক্টর জেনারেল অব ফরেস্ট (ওয়াইল্ডলাইফ), পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, ভারত। সভায় উভয় দেশের মোট ৩৫ জন বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও বিশেষজ্ঞ অংশগ্রহণ করেন। আলোচনা সভায় একটি প্রোটোকল, একটি স্ট্যান্ডার্ড অপারেশনাল প্রসিডিউর এবং পূর্ববর্তী দু'টি সভার মাধ্যমে গৃহীত ১৭টি ঐক্যমতের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা হয়। আন্তঃসীমান্ত হাতি সংরক্ষণের জন্য ইতোমধ্যে ভারত ও বাংলাদেশ দুটি পৃথক ওয়ার্কিং গ্রুপ তৈরি করেছে। কোন এলাকা দিয়ে এবং কোন সময়ে হাতি বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত অতিক্রম করে, তা নির্ধারন করা গেছে; তাৎক্ষনিকভাবে এই গমনাগমনের তথ্য উভয় দেশের কোন সংস্থার কাছে সরবরাহ করা হবে, এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়। আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে হাতির চলাচলের তথ্য সংগ্রহ করে তা সংরক্ষণের ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। বন থেকে হঠাৎ লোকালয়ে চলে আসা হাতিকে আবার বনে ফিরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করার জন্য তাৎক্ষনিক ব্যবস্থা হিসেবে একটি দল গঠনের প্রস্তাব আসে, যার ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে এলিফ্যান্ট রেসপন্স টিম গঠন করেছে। বর্ডারে দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার মাধ্যমে আন্তঃসীমান্ত হাতি চলাচলের তাৎক্ষণিক তথ্য আদান প্রদানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করার বিষয়ে আলোচনা হয়। পারস্পরিক তথ্য আদান প্রদানের জন্য সীমান্তবর্তী জেলাসমূহের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা এবং

সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর কমান্ড্যান্টের সমন্বয়ে একটি যৌথ সমন্বয় গ্রুপ গঠনের প্রস্তাব করা হয় যাতে করে সংশ্লিষ্ট জেলাগুলোর এক বা একাধিক কোরিডোর দিয়ে হাতির গমনাগমনের তথ্য বিনিময় করা যায়। উভয় দেশের সীমান্তবর্তী জেলাসমূহের জেলা প্রশাসকগণকে বিশেষ প্রয়োজনে উভয় দেশের এলিফ্যান্ট রেসপন্স টিমকে কাজের স্বার্থে সীমান্ত অতিক্রমে সহায়তা করার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করা হয়।

আন্তঃসীমান্ত হাতি সংরক্ষণে তৃতীয় বাংলাদেশ-ভারত দ্বিপাক্ষিক সভা

শকুন সংরক্ষণে ৮ম রিজিওনাল স্টিয়ারিং কমিটির সভা

৩ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখে দক্ষিণ এশিয়ায় শকুন সংরক্ষণে বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগে ৮ম রিজিওনাল স্টিয়ারিং কমিটির সভা প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেল, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ শাহাব উদ্দিন, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব আবদুল্লাহ আল মোহসীন চৌধুরী, সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়। সভায় বাংলাদেশ ছাড়াও ভারত, নেপাল, কম্বোডিয়া, পাকিস্তানের প্রতিনিধি এবং আন্তর্জাতিক শকুন বিশেষজ্ঞগণ উপস্থিত ছিলেন। রিজিওনাল স্টিয়ারিং কমিটি (RSC) বিশ্বব্যাপী বিপদাপন্ন শকুন সংরক্ষণে কাজ করে আসছে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- ডাইক্লোফেনাক এবং ক্ষতিকর NSAIDs উৎপাদন ও বিক্রি বন্ধে বিভিন্ন দেশকে উৎসাহিত করা; শকুনের নিরাপদ বাসস্থানের জন্য Vulture Safe Zone ঘোষণা করা; অন্তঃদেশীয় Vulture Safe Zone ব্যাবস্থাপনা; দ্বিপাক্ষিক আলোচনা ইত্যাদি। ৮ম রিজিওনাল স্টিয়ারিং কমিটির সভায় উপস্থিত সকল দেশ তাদের নিজ নিজ দেশে শকুন সংরক্ষণে গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করে।

শকুন সংরক্ষণে ৮ম রিজিওনাল স্টিয়ারিং কমিটির সভা

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যঃ

১. পৃথিবীতে বনভূমির পরিমাণ ৩১% ।

২. পৃথিবীতে সর্বোচ্চ ৯৮% বনভূমির দেশ ফ্রেঞ্চ গুয়ানা।

৩. রাশিয়া, ব্রাজিল, কানাডা, আমেরিকা, চীন, অস্ট্রেলিয়া, কঙ্গো, ইন্দোনেশিয়া, পেরুএবং ভারতে পৃথিবীর ৬৬% বন আছে।

৪. কাতার, জিব্রালটার, হলি সি, মোনাকা, নাউরচ, সান ম্যারিনো, সেইন্ট ব্যথেলিমাই, ফকল্যান্ড, আইল্যান্ড ও সালবার্ড এন্ড জেন মেইন আইল্যান্ডে কোন বনভূমি নাই।

৫. প্রতিদিন ২০০ বর্গ কিলোমিটার বন হারিয়ে যাচ্ছে।

৬. প্রায় ১.৬ বিলিয়ন মানুষ জীবন-জীবিকার জন্য বনের উপর নির্ভরশীল।

৭. পৃথিবীতে ৩০০ মিলিয়নের অধিক লোক বনে বাস করে।

৮. পৃথিবীর স্থলভাগের জীববৈচিত্র্যের ৮০% বন ধারণ করে।

৯. পৃথিবীর মোট অক্সিজেনের ৪০% এর বেশি Tropical Rainforest থেকে উৎপন্ন হয়।

১০. পৃথিবীর মোট গ্রীন হাউস গ্যাসের ১৭.৪% ডিফরেস্টেশন এবং ফরেস্ট ডিগ্রেডেশন থেকে নির্গত হয়।

১১. পৃথিবীতে বনের বায়োমাসে (Bio-mass) ২৮৯ গিগাটন কার্বন মজুদ আছে।

১২. বাংলাদেশের ভূ-উপরিস্থ বায়োমাসের (Bio-mass) মোট পরিমাণ ৮,৪৬,০০০ হাজার টন।

১৩. বাংলাদেশে হেক্টর প্রতি ভূ-উপরিস্থ বায়োমাসের (Bio-mass) পরিমাণ ৫৭ টন।

১৪. বাংলাদেশের বনে ভূ-উপরিস্থ বায়োমাসের (Bio-mass) পরিমাণ ২,৭৮,০০০ হাজার টন।

১৫. বাংলাদেশের বনে হেক্টর প্রতি ভূ-উপরিস্থ বায়োমাসের (Bio-mass) পরিমাণ ১৯৩ টন।

১৬. বাংলাদেশের ভূ-উপরিস্থ মোট কার্বনের পরিমাণ ৪,২৩,০০০ হাজার টন।

১৭. বাংলাদেশের ভূ-উপরিস্থ হেক্টর প্রতি কার্বনের পরিমাণ ২৯ টন।

১৮. বাংলাদেশের বনে ভূ-উপরিস্থ মোট কার্বনের পরিমাণ ১৩৯,০০০ হাজার টন।

১৯. বাংলাদেশের বনে ভূ-উপরিস্থ হেক্টর প্রতি কার্বনের পরিমাণ ৯৬ টন।

তথ্যসূত্রঃ
i. National Forest Inventory 2016-2019
ii. FAO, UN-REED, UNDP, UNEP & IUCN website
iii.বন অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট ইউনিটসমূহ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক এর কিছু আলোকচিত্রঃ

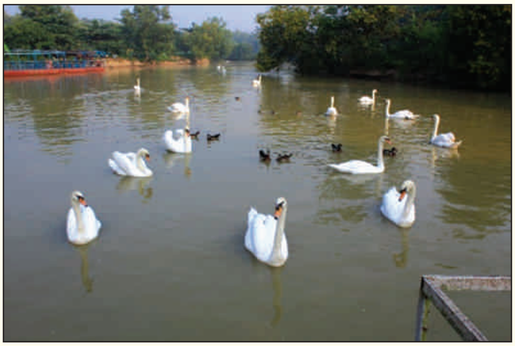

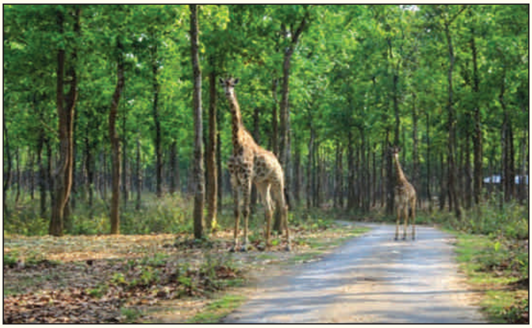

বন, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ওয়েবসাইট সমূহের ঠিকানা নিম্নরূপঃ

১. পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ঃ www.moef.gov.bd

২. বন অধিদপ্তরঃ www.bforest.gov.bd

৩. পরিবেশ অধিদপ্তরঃ www.doe-bd.org

৪. বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টঃ www.bcct.gov.bd

৫. বাংলাদেশ বন গবেষণা ইন্সটিটিউট: www.bfri.gov.bd

৬. আই.ইউ.সি.এনঃ www.iucn.Bangladesh

৭. আন্তর্জাতিক খাদ্য সংস্থাঃ www.fao.org

৮. বন্যপ্রাণি সংরক্ষণ সংস্থা, বাংলাদেশঃ www.wild-team.org

৯. নিসর্গ নেটওয়ার্কঃ www.nishorgo.org

১০. সি.এন.আর.এস. বাংলাদেশঃ www.cnrs.org.bd

১১. বি.সি.এ.এস.ঃ www.bcas.net

১২. উন্নয়ন অন্বেষণঃ www.unnayan.org

১৩. বিশ্ব বন্য প্রাণি সংস্থাঃ www.wwf.org

১৪. বিশ্ব বাঘ সংরক্ষণ সংস্থাঃ www.tiger-global.co.uk

১৫. বন্যপ্রাণি সংরক্ষণ সংস্থাঃ www.wcs.org

১৬. জুওলজিক্যাল সোসাইটি অব লন্ডন ঃ www.zsl.org

১৭. ইউ.এন.ডি.পিঃ www.undp.org

১৮. বিশ্ব ব্যাংক ঃ www.worldbank.org

১৯. ক্যারিনাম ঃ www.carinam.com

২০. রামসার কনভেনশন ঃ www.ramsar.org

২১. ওয়ার্ল্ড ফিস ঃ www.worldfish.org

২২. বাঘ সংরক্ষণ সংস্থা ঃ www.globaltigerinitiative.org

২৩. ইউএন-রেডঃ www.un-redd.org

২৪. ইউএনএফসিসিঃ https://unfccc.int

২৫. আইপিসিসিঃ www.ipcc.ch

২৬. ইসিমোডঃ www.icimode.com

প্রকাশকাল ঃ

তথ্যসেল, বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০১৯, বন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত।

সম্পাদনাঃ

Since 2009 the German Government has been supporting the Bangladesh Forest Department to improve biodiversity conservation and adaptation to climate change in and around the Sundarbans Mangrove Forests

Support to the Management of the Sundarbans Mangrove Forests Project (SMP II)

COMMISSIONED BY
German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ)

IMPLEMENTING AGENCIES
Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC) and its Bangladesh Forest Department (BFD) as well as the *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit* (GIZ) GmbH.

PROJECT OBJECTIVE
The BFD as well as those communities and local administration, that are part of the co-management structures, implement co-management, SMART and ecological monitoring as instruments of the sustainable management of the Sundarbans Mangrove Forest.

TARGET GROUP AND AREA
Poor sections of the population (women, men, families) - including landless groups - living in periphery of the Sundarbans. The focus is on the members of the co-management structures, especially natural resource user groups in the Sundarbans and women's groups. Activities with the local population focus on Chandpai and Sharankhola Ranges in Bagherat District, while management related activities cover the entire Sundarbans. Policy advisory is relevant to the national level.

DURATION
May 2019 to April 2022

INTERVENTION AREAS
SMP II is a follow-on project of SMP I (Management of the Sundarbans Mangrove Forests for Biodiversity Conservation and Increased Adaptation to Climate Change Project, May 2015 - April 2019). It strongly builds on and the achievements of SMP I and further develops successful approaches.

Area 1: Strengthening actors that are part of the **co-management** structures to better fulfil the roles and functions.

Area 2: Capacitate BFD to independently use the spatial monitoring and reporting tool (**SMART**) in its forest protected areas.

Area 3: Enhancing the capacities of the BFD for **ecological monitoring** of the Sundarbans.

SELECTED ACHIEVEMENTS
- Poor resource users and women living in the periphery of the Sundarbans will be empowered to better participate in the co-management of the Sundarbans. They will receive trainings on how to hold meetings and channel their concerns from the grass-roots to the decision-making level. The BFD will benefit from institutional development and policy advisory in line with the existing rules and regulations, which will help to further sharpen the roles and procedures that govern co-management at the site and national level.
- A central data management platform, a pool of master trainers, and standardised training modules will allow the BFD to independently implement SMART in the Sundarbans as well as expand the SMART approach to other forest protected areas. A national SMART strategy will guide this process.
- A long-term monitoring system of the Sundarbans including relevant parameters to be measured, will be developed. Forest officials' capacity to design and execute ecological monitoring as well as interpreting the data will be enhanced enabling them to better assess and mitigate potential negative impacts.
- An updated version of the Integrated Resource Management Plan (IRMP) for the Sundarbans (2021 - 2030) will be available to support managers in their task to ensure sustainable management of its resources.

শিক্ষায় বন প্রতিবেশ
আধুনিক বাংলাদেশ

বন অধিদপ্তর

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়